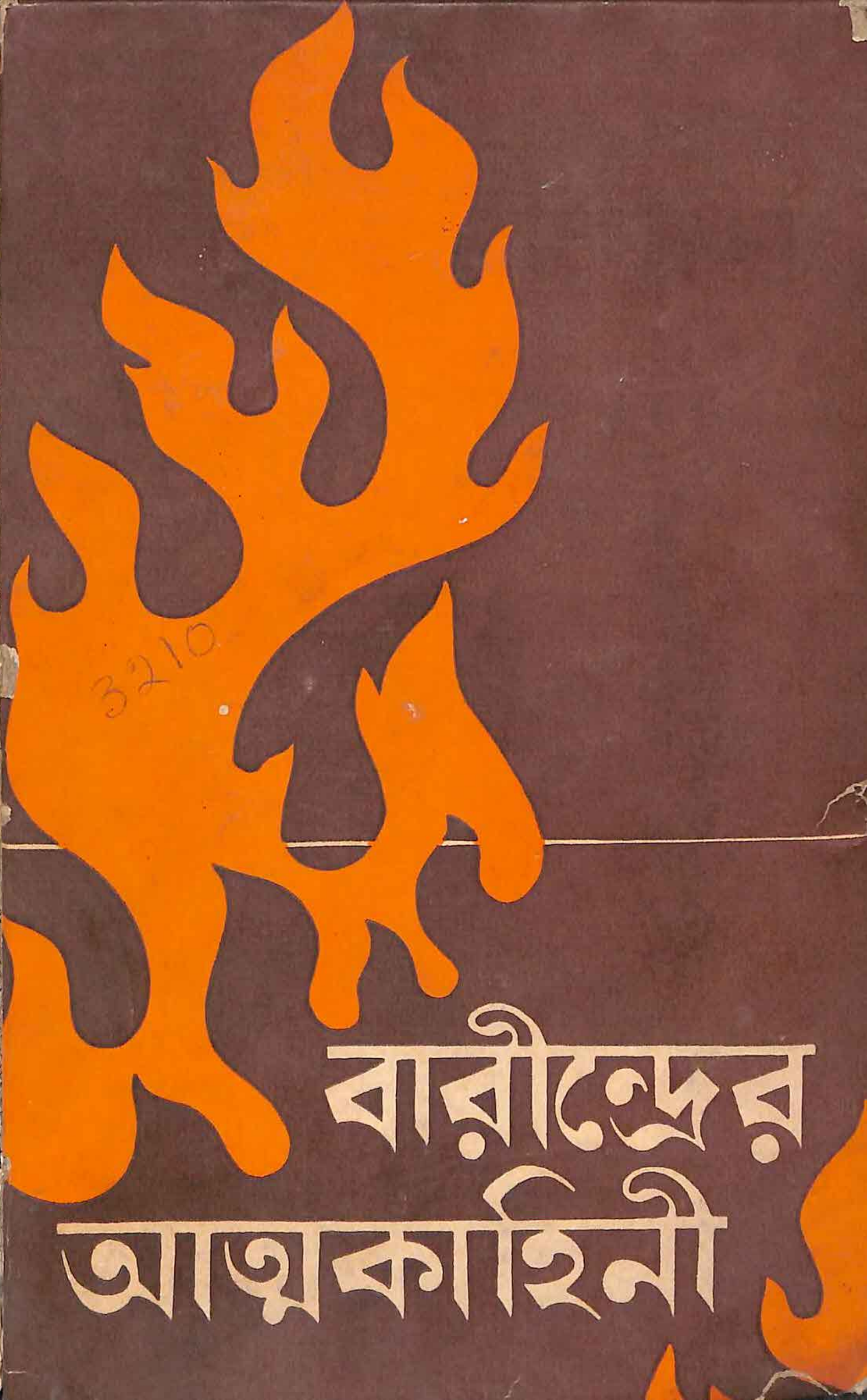


বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী

/c

বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী

ধর-পাকড়ের যুগ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ডি এম লাইব্রেরী
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

নূতন সংস্করণ : মাঘ ১৩৭৯

মূল্য চার টাকা

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবীদের মরণপণ সংগ্রাম আজ ইতিহাসে পর্যবসিত। এই বিপ্লবীদের প্রথম সারির অন্যতম ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। স্বদেশের মুক্তি-কামনায় তাঁদের মনপ্রাণ বিপ্লবের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল—তাঁদের জাগরণের চিন্তা আর নিদ্রার স্বপ্ন ছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন।

বর্তমান গ্রন্থ ধরপাকড়ের কাহিনী। এতে বিপ্লব-সংগঠন ও তার অকপট ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের জলন্ত ইতিহাস আজ স্বাধীন ভারতেও সমান মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে নিঃসন্দেহে।

অর্ধশতাব্দী পরে এই গ্রন্থ নবকলেবরে পুনর্মুদ্রণ আমাদের প্রকাশন সংস্থার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৩২৯ সালে ডি এম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁদের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক ছিল "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী"। তাই আজ আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্বুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আমরা আমাদের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ করতে পেরে গৌরব অনুভব করছি। আশা করি, স্বাধীন ভারতের পাঠকবর্গের কাছে নবপরিবেশিত গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করে ধন্য হবে।

চৈতন্য লাইব্রেরীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীতপব্রত ঘোষ মহাশয়ের সহযোগিতায় বইখানি সংগৃহীত হয়েছে ; তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মাঘ ১৩৭৯

শ্রীগোপালদাস মজুমদার
প্রকাশক

সূচীপত্র

[প্রথম সংস্করণের নামপত্র]

বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী

ধর পাকড়ের যুগ।

["বিজলী"র দ্বীপান্তরের কথা হইতে
পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত]

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

১৩২৯

[মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীবিধুভূষণ দে,
ডি, এম, লাইব্রেরী
৯৩/১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯৩/১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চেরি প্রেস লিমিটেড হইতে,
আর, কে, রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত করকমলে—

ভাই নলিনী,

তুমি মরণের যাত্রায় আমার সঙ্গে এসে জুটেছিলে

আবার আজ নতুন জীবনের

মহাসাধনায়ও আমার সঙ্গে আছ ;

এ নতুন জন্ম লাভ হ'লে

নব-সৃষ্টির মহাক্ষণেও

দু'জনে একত্র থাকবো

এই আশার নিদর্শন স্বরূপ

এ কাহিনী

তোমার হাতে দিলাম।

ইতি—

তোমার

বারীন-দা'

ভূমিকা

বিজলীতে আমার আত্মকাহিনীর যে অংশটুকু "দ্বীপান্তরের পথে" বলে বেরিয়েছিল, এটি পুস্তকাকারে তারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। এ কাহিনীর প্রথম খণ্ড "বোমার কথা", দ্বিতীয় খণ্ড "দ্বীপান্তরের পথে" এবং তৃতীয় খণ্ড "দ্বীপান্তরের কথা"। কিন্তু কাহিনীটি বলতে গিয়ে শেষের দিক থেকেই বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা তিন খণ্ডকে একত্র করেই ছাপাবো।

এ কাহিনীতে সব কথা অকপটে বলা হয় নি, কারণ সে যুগের সব কথা বলা যায় মাত্র এক স্বাধীন ভারতে। আমাদের দেশের পায়ের শিকল এই সবে মাত্র খুল্‌ছে, এখনও আমরা অনেকাংশে বদ্ধ। আমার দেশ-মাতা যদি কখন রাজ-রাজেশ্বরীরূপে উদয় হন, তখন বেঁচে থাকলে এ কথা আবার বল্‌বো। আবার বল্‌বার দরকার আছে, কারণ আসল কথাই—সে শক্তির যুগের ঋষিদের নিয়ন্তাদের কথাই বলা হয় নি।

ইতি

গ্রন্থকার



বারীন্দ্র কুমার
(ফাঁসীর প্রতিক্ষায়)

INDIAN ART SCHOOL
CALCUTTA

১

গুরু-লাভ

কেমন যেন একটা চির অতৃপ্ত ক্ষুধা লইয়া, কি অপ্রাপ্য ধন পাইবার আশায় আমি জন্মিয়াছিলাম, তাই কোন কাজই করিয়া আমার মনপ্রাণ কখনও ভরিল না। দেশ যখন মনের সুখে তামস নিদ্রায় ঘুমাইতেছিল, তখন আর দু'চারটি অসমসাহসিক মানুষের সঙ্গে আমিও রাজনীতিক হিসাবে এ বাঙলায় প্রথম জাগিয়াছিলাম। জাগিয়া সে দুরাকাঙ্ক্ষার জাগ্রত-স্বপ্নে দেশ-মায়ের যে মুক্ত রাজরাণীর ছবি তখন দেখিয়াছিলাম, সারা ভারতের তাহাই আজ আরাধ্য দেবতা হইয়াছে। তবু তখন আমরাই, মুষ্টিমেয় কয়জন দুঃসাধ্য-সাধক মানুষ, ভাবের রঙে, কল্পনার তূলিতে, হৃদয়ে হৃদয়ে সে ছবি আঁকিতেছিলাম। নিজের জীবন অবধি পণ করিয়া, কত না অসাধ্য সাধনে এক রকম বিনা পাথেয়, বিনা সম্বলেই আমাদের এ পথে সে অভিসার। একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া নিঃস্বার্থ মুক্ত নির্ভয় প্রাণ একত্র করিয়া কর্ম্মীদল গঠন ছিল প্রধান কাজ; কিন্তু এত করিয়াও মনপ্রাণ আমার ভরে নাই। ১৯০২ সালে আমাদের প্রথম ষড়যন্ত্রের বীজবপন, বলিতে গেলে এক রকম তাহার ফলেই ১৯০৬ সালে, স্বদেশীর দেশব্যাপী প্লাবনেও আমাদের কর্ম্মের যে একাগ্র যোগ ভাঙিয়াও ভাঙিতে পারে নাই, অন্তরের "অপাওয়া পাওয়া"র ক্ষুধাই তাহাকে একদিন টলাইয়া দিল। আমাদের ক্রমশঃ ধারণা হইল যে, ভাগবত জ্ঞানে ও শক্তিতে বলীয়ান না হইলে, দীন মানুষকে দিয়া এ আয়োজন—এ যজ্ঞ কখনও পূর্ণ হইবে না। আমি তাই মানুষকে

মহান্ ও বৃহৎ করিয়া গড়িবার মাল মসলার আশায় সাধু খুঁজিতে বাহির হইলাম।

অনেক প্রকার বাতিকের সহিত ধর্ম্মের বাতিকও আমাদের পরিবারের একটা পারিবারিক ব্যাধি। আমার মাতামহ শ্রীরাজনারায়ণ বসু ঋষি-রাজনারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন; দেওঘরে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যাঁহারা তীর্থ দর্শনে যাইতেন, তাঁহারা বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া এই জীবন্ত বুড়াশিবকে একবার দর্শন না করিয়া ফিরিতেন না। বার বৎসর বয়স হইতে আঠার বৎসর বয়স অবধি, ছয় বৎসর কাল এই সাধকের সঙ্গ দিবানিশি পাইয়া, আমার অজ্ঞাতেই আমার জীবনের গতি কবে না জানি ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই আমার কৈশোরে কবে এক দিন শ্রীইন্দুভূষণ রায় তাঁহার বীণাখানি আর তাঁহারি রচিত গানের বই "রসলীলা" লইয়া দেওঘরে আমাদের বাড়ীতে আসেন। তাঁর সেই অদ্বৈত প্রেমের উপমাহীন গানে অত ছেলে-বেলায়ও আমায় পাগল করিয়া দিয়াছিল—

"বঁধুয়া রে
ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলী তুই মোর
তোরে বুকে করি আমি পাগলিনী তোর।
তোরে বুকে করি যাই যথায় তথায়
টলে না পাগল মন কোন ভাবনায় রে।
হাট বাট মাঠ ঘাট তরুতল পাই
তোর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাই রে।
কেড়ে নিতে চায় কেহ ফেলে দিতে বলে
পাগলী বাঁচিবে কেন ও-ধন না হলে রে।"

এই সব গানের অনন্তমুখী তান এখনও মনের যন্ত্রে জীবন ভরিয়া বাজিতেছে। তখন তাই অত রাজসিক কর্ম্মের হট্টগোলেও জীবনের এই নিভৃত সুরটুকু ডুবিয়া যায় নাই। জীবন আমাদের ভগবদ্‌মুখী হইবার আর এক কারণ, বঙ্গ-ভঙ্গের পরে আমাদেরই একজন বড়

কাজের কাজী "ভবানী মন্দির" বলিয়া একখানি পুস্তিকা লেখেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, নিভৃত পর্ব্বত গুহায় ভবানীর মন্দির হইবে, সেইখানে সাধনায় সিদ্ধ শক্তিমান আধারে ভগবতী বিগ্রহ ধরিয়া দেশকে মুক্তিযজ্ঞে দীক্ষা দিবেন। আমাদের পাগল করিবার যেটুকু বাকি ছিল, তাহা এই "ভবানী মন্দির" করিয়া ছাড়িল। বইখানির লেখা যেমন অপূর্ব শক্তিব্যঞ্জক, বিষয়ও তেমনি মনপ্রাণ-ভরা, তাই সেই অবধি এই নেশায় আমাদের পাইয়া বসিল।

ভগবানের পথ বড় সহজ; দুর্লভ হইয়াও, কঠিন হইয়াও, ক্ষুরের ধারের অধিক সুতীক্ষ্ণ হইয়াও বুঝি সহজ। মানুষ কিন্তু সহস্র বাসনার ফেরে, সে সহজ পথকে দীর্ঘ ও জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সে পরম সহজ ধনকে সহজে পাইয়া বুঝি অত ছেলেবেলায়ও কাহারও সুখ হয় না। তাই সে পথ চাহিয়াও তখন পাই নাই, তাই চাহিতে চাহিতেই জীবনে কত গলি ঘুঁজি ঘুর-পথ ঘুরিতে হইল, জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিয়া সে চাওয়ার কতই না পরীক্ষা দিতে হইল।

বরোদায় থাকিতে শুনিয়াছিলাম, নর্ম্মদার তীরে চান্দোতে ব্রহ্মানন্দ নামে এক সিদ্ধ যোগী আছেন। আমি যখন সাধু খুঁজিতে বাহির হইলাম, তখন ব্রহ্মানন্দের দেহান্ত ঘটিয়াছে, তাঁহার শিষ্য কেশবানন্দ তখন সে মঠের মঠাধিকারী। আমি কেশবানন্দের উদ্দেশেই বাহির হইয়াছিলাম। সঙ্গের সাথী ছিল উপেন। ট্রেণে চড়িয়া সেই দীর্ঘ অনির্দ্দেশ যাত্রার মুক্তির আস্বাদ আজও বেশ মনে আছে। মনে হইল আজ আমাদের সম্মুখে অজানা অফুরন্ত জীবন-পথ, আর পশ্চাতে অতীত; যেন কতবড় গুরুভার দেবকীর পাষাণ বুকের উপর হইতে জন্মের শোধ নামাইয়া মুক্তির সুখে ছুটি লইয়া চলিয়াছি। তখন জানিতাম না—সেই যাত্রাই আমার সত্য সত্যই মুক্তির যাত্রা, তখন বুঝি নাই সেই দিনই আমার জীবনের চাকা অমন করিয়া ঘুরিয়া যাইবে।

ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে গিয়া কিন্তু বড় নিরাশ হইতে হইল। সাধু

খুঁজিতে আসিয়া সাধু তো মিলিলই না, মিলিল সাধুর বেশে এক তত্ত্ব-জ্ঞানহীন শুষ্ক জ্ঞানী। নর্ম্মদার জলের স্রোতে শবাসনে গা ভাসাইয়া ভাসাইয়া তিনি সমস্ত পাতঞ্জল যোগসূত্র নিত্য আবৃত্তি করেন, শ্রোতা পাইলে অনর্গল "যোগশ্চিত্তবৃত্তির্নিরোধঃ" সম্বন্ধে কর্কশ বক্তৃতা ঝাড়েন, চুরাশী আসনের কসরতে লোকের চমক লাগাইয়া পারমার্থিক সার্কাসে বাহবা নেন, শ্বাসরোধ করিয়া ভগবানের দেওয়া জিহ্বাটাকে কণ্ঠে প্রবেশ করাইয়া, পেটের চামড়া পিঠে ঠেকাইয়া, তাঁহার সাধু বলিয়া কষ্টার্জ্জিত সুনাম কষ্টে রক্ষা করেন। ভগবানের বৈকুণ্ঠের দুয়ারের অনেক বাহিরে তাঁহার এই ধর্ম্মের দোকান; ভগবানের স্বরূপ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে কথার ঝড়ে সেখানে প্রাণ বাঁচান দায় হয়। ব্যাপারখানা দেখিয়া সহজে ভগ্নোদ্যম উপেন নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিল। আমি তখন একরকম 'মরিয়া', কাজেই তাঁহারই কাছে আসন শিখিতে বসিয়া গেলাম।

এই মঠে একটি বেদ-পাঠশালা ছিল, তাহার ভার ছিল একজন ব্রহ্মচারীর উপর। ব্রহ্মচারী তখনও যুবক, অনেক খুঁজিয়াও ভগবানের দেখা সে তখনও পায় নাই। সে বলিল, "বাবুজী! সরে পড়, এর কাছে কিছু নাই।" এইরূপ ইতস্ততের মধ্যে একদিন ল্যাঙোট কসিয়া একটি নির্জ্জন ঘরে মাথা নীচু ও পা উঁচু করিয়া বৃক্ষাসন করিতেছি, হঠাৎ একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। সে অযাচিত ভাবে আমায় ধরিয়া আসনে স্থির হইবার জন্য সাহায্য করিতে লাগিল! ভগবানের দেখা পাইবার আশায়, উল্টা ডিগবাজী খাইতে খাইতে শেষে গলদ্ঘর্ম্ম দশায় অগত্যা বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দেখিলাম, মানুষটি খর্ব্বকায়, গৌরকান্তি, চক্ষু নীল, মাথায় তার প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী, পায়ে নাগরা, বেশভূষার বড় একটা পারিপাট্য নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেহ ভরিয়া যেন একটি অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শুচিতা বিরাজ করিতেছে। লোকটি চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, বেদ-পাঠশালার শিক্ষক হইয়া ইঁহারই আসার কথা ছিল,

আজ আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, এখানে তাঁহার চাকুরী করা পোষাইবে না। সে তো বলাই বাহুল্য; মানুষের মধ্যে কিছু বস্তু থাকিতে তো এখানে পোষাইবার কথা নয়।

তখন দেশের কাজ আমার শিখা ধরিয়া মর্ম্মান্তিক টান টানিতেছে। নর্ম্মদার উপর এ নির্জ্জন মঠ আমার সহিবে কেন? চারি দিকে উঁচু নীচু টিপি, রজতশুভ্রা নর্ম্মদার কাশঢাকা তট, মাঠের মাঝে দলে দলে বন্য হরিণ আর তরী-ভরা যাত্রীর কণ্ঠে ঘন ঘন "জয় নর্ম্মদে" ধ্বনি। অশান্তের কি এত শান্তি সহ্য হয়? দুই একদিন থাকিয়া আমি এক মাইল দূরে চান্দোত গ্রামে আসিলাম, সেইখানে রেল ষ্টেশন। সেই রেলপথে কোন এক ষ্টেশনে আমার ব্রাহ্মণ বন্ধু গায়কোয়াড়ের নায়েবসুবার কাজ করে। ট্রেণে করিয়া তার বাসায় আসিয়া পঁহুছিতে বেলা দুপুর বাজিল, তখন সে পেটের দায়ে কোর্টে নথীপত্র ঘাঁটিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়া দেখি সেই বেঁটে গৌরাঙ্গ পুরুষটি একখানি চেয়ারে সমাসীন। পরস্পর বিস্ময়সূচক কুশল প্রশ্ন হইয়া চুকিবার পর তিনি আমায় প্রশ্ন করিলেন, "এ অঞ্চলে তুমি বাঙলার মানুষ কি করছো?"

আমি। গুরু খুঁজছি।

পু। কেন?

আমি। আমি কোন কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের ভার নিয়েছি, ভগবানের কৃপা বিনা সে ব্রত উদ্‌যাপন হবে না বলে ধারণা হয়েছে।

পু। আমি সবই জানি।

তিনি আমাদের গুপ্ত সমিতির নাড়ী-নক্ষত্র সব বলিয়া দিলেন। শুনিলাম তিনিও একদিন এই সমিতির মহারাষ্ট্রীয় শাখায় ছিলেন, এখন তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "গুরু খুঁজছ? এসো আমার কাছে সাধন নাও।" আমি তো অবাক্! এ আবার কি রকম বুজরুক রে, বাবা! নিজে যাচিয়া মন্ত্র দিতে চায়!! আমি প্রশ্ন করিলাম, "আপনি ভগবানের পথ জানেন কি?"

পু। কিছু কিছু জানি বই কি! তুমি নাও না, যা চাও তা' আমারই কাছে পাবে।

আমি। কখন দিবেন?

পু। এখনি।

আমি। দিন, আমি নেব।

তিনি আমায় একটি নির্জ্জন কক্ষে লইয়া দ্বার দিলেন। অন্ধকারে মুখামুখী দু'জনে দুই পৃথক আসনে বসিলাম। তিনি বলিলেন, "চক্ষু মুদিয়া থাক, চাহিয়া দেখিও না, কিছুই ভাবিও না।" প্রায় পনর মিনিট পরে চক্ষু চাহিতে বলিলে চাহিয়া দেখিলাম, তেমনি দু'জনে বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন, "কিছু অনুভব করলে কি?"

আমি। না। ঘুম পাচ্ছিল।

পু। ভাবনা নেই, তোমার হবে।

আমি তো অবাক্! কিছুই হ'লো না, আর বলে কিনা "হবে"!

ইহারই নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে। রবীন্দ্রের কবিতায় আছে 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর', এই পরশ পাথর অন্বেষণে পাগল দেশ দেশান্তর ঘুরিত, আর উজ্জ্বল নুড়ি পাইলেই কোমরের লৌহ-শিকলে ঠেকাইয়া ফেলিয়া দিত, বহুদিন ব্যর্থ হইয়া হইয়া নিরাশায় অনভ্যাসে শিকলের দিকে আর চাহিত না। একদিন কোমরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ক্ষ্যাপা দেখিল, কবে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে পরশমনি ঠেকিয়া তাহার লোহার শিকল সোনার হইয়া গিয়াছে! হেলায় সে মনি ফেলিয়া দিয়াছে, চাহিয়া দেখে নাই। আমারও এই মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ সেই ক্ষ্যাপার মত, তেমনি হেলায় অযত্নে পাওয়া, তেমনি লোহাকে সোনা করা কাণ্ড। লেলেকে পাইয়া আমার শত-ছিদ্র ডুবোন-তরীও শেষে কিনা পারের মুখে চলিল।

২

সাখরিয়া স্বামী

এ মন্দ ব্যবস্থা নয়! এতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া অনর্থক পণ্ডশ্রমের পর বলে কিনা "তোমার হবে!" আমি বলিলাম "হয় হোক, সে তো পরে দেখা যাবে'খন; এখন আগে আমায় মন্ত্র দিন।" যাঁহার সহিত এত কাণ্ড, তাঁহার নাম শ্রীবিষ্ণুভাস্কর লেলে তাহা বলিয়াছি। জাতিতে তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, জয়পুরের অধিবাসী। লেলে স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন, "সাধন তো পেলে মন্ত্র নিয়ে কি করবে?" তাহা বলিলে কি হয়? তখন আমার দরকার, দেশের কাজে ভগবানকে ভাঙাইয়া খাওয়া; তাহার জন্য রীতিমত দীক্ষা চাই, আড়ম্বর আয়োজন চাই, গৈরিক রুদ্রাক্ষ চাই, তাহা না হইলে চলিবে কেন? আমি বলিলাম, "আমি ব্রহ্মচর্য্যের মন্ত্র নেব।"

লে। আমি সংসারী, মন্ত্র দেবার অধিকারী নই; সাধন অবধি দিতে পারি।

আ। কেশবানন্দের কাছে নেব কি?

লে। (চিন্তা) না, ও সাধক নয়, সন্ন্যাসী-বেশধারী। তুমি সাখরিয়া স্বামীর কাছে মন্ত্র নেও। সেও সাধক নয় বটে, কিন্তু ত্যাগী ও শুদ্ধ সন্ন্যাসী।

কাজেই আমায় আবার পূর্ব্বপথে চান্দোতে ফিরিতে হইল, কারণ চান্দোতেই সাখরিয়া বাবার আশ্রম। আমি আর একবার এই পথে যাইবার কালে তিনি আশ্রমে ছিলেন না, সাম্বাৎসরিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে গিয়াছিলেন। এবার ফিরিয়া তাঁহাকে পাইলাম, প্রণাম

করিয়া সোজাসুজি মন্ত্র গ্রহণের আব্দার জানাইলাম। সাধুরা আর যাই হউন আর নাই হউন, করুণার অবতার সন্দেহ নাই ; নহিলে আমার মত অহঙ্কারী, কর্ম্মপাগল, অশুদ্ধ মানুষকে লেলের মত সাধক যাচিয়া অমন অমূল্য বস্তু কি দেয় ? যখন সাখরিয়া অন্বেষণে বাহির হইলাম তখন লেলে আমায় ষ্টেশনে দিয়া গেলেন, সমস্ত পথ সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া আসিয়াছিলেন। মুক্ত সাধকের সে প্রেমভরা আত্মহারা চাহনি—আমার জন্য সে আকুল ব্যাকুল ভাব, কখন ভুলিবার নয়। লেলের চক্ষের দৃষ্টি ছিল স্বতঃই বিহ্বল, অন্তর্মুখ ও অনির্দ্দিষ্টতারক। আমাকে পাইয়া তিনি যেন বহুকালের হারানো প্রিয়জন পাইয়াছিলেন।

সাখরিয়াও তাই, আমায় দেখিবামাত্রই কেমন যেন ভাল বাসিয়া ফেলিলেন। সাখরিয়ার আসল নাম বিশ্বেশ্বরানন্দ স্বামী, তিনি গৌরকান্তি দীর্ঘাকার পুরুষ, বয়স ষাটের কাছাকাছি, মুখ সদা হাস্য মাখা, দেহ গৈরিকাবৃত, ঋজু ও সরল, মুণ্ডিত শির। সন্ন্যাসীর হাতে দণ্ড ও কাঁধে সর্ব্বদা মিছরির ঝোলা। ইনি যৌবনে সিপাহী বিদ্রোহের সময়, ঝাঁসির রাণীর সহিত একত্র ইংরাজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাণীর শেষ জীবনের অনেক ব্যাপারই তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। রাণীর মৃত্যুর পর নিজ হস্তে সে পবিত্র দেহ চিতায় তুলিয়া দিয়া মনের বেদনায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন অশুভ কাল, উত্তরায়ণের সময়, সে সময়ে মন্ত্র বা দীক্ষা দেওয়া দূরে থাক, কোন মঙ্গল কার্য্যই হয় না। আমার কথায় হাসিয়া সাখরিয়া ঝোলা হইতে মিছরি বাহির করিয়া খাইতে দিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মিছরি খাওয়ান ইঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে, তাই নাম হইয়াছে সাখরিয়া (সাখর—চিনি) স্বামী। এই মঠের ব্যয় বৎসরে বার হাজার টাকা। স্বামীজী এক একবার টাকার তাগাদায় বাহির হন, গুজরাতি মহাজন শেঠদের বাড়ী চড়াও হইয়া টাকা এক রকম জবরদস্তি কাড়িয়া লন, তাহার পর আশ্রমে ফিরিয়া সেই কষ্টার্জ্জিত অত অর্থ দুই দিনের

মহাভোজে আবালবৃদ্ধকে খাওয়াইয়া উড়াইয়া দেন। সে দিন আশ্রমের পথ মাড়াইয়া রাজা গজা লাট বেলাট কাহারও তাঁহার কাছে মেঠাই না খাইয়া পলাইবার জো নাই। সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলে সাধু গ্রেপ্তার করিয়া আশ্রম মধ্যে আটক করেন। এত দুঃখের ভিক্ষায় ও পর্য্যটনে এ অর্থ সংগ্রহ করিবারই বা দরকার কি, আর এমন করিয়া দুই এক দিনে উড়াইবারই বা অর্থ কি? বিধাতা জানেন আর জানেন এই অদ্ভুত মানুষটির অন্তর-পুরুষ! তাহার পর নিত্য পনর বিশ জন সন্ন্যাসী অতিথির সেবা করিয়া এ মঠ চলিত যে টাকায়, তাহা আপনিই অযাচিত ভাবে আসিত।

আমায় ঝোলা হইতে মিছরি খাওয়াইয়া, সাখরিয়া বাবা অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "অকালে মন্ত্র দেওয়া হয় না, বেটা।"

আমি। না হয়, আমি ফিরে যাই। আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

সা। আচ্ছা, থাকো থাকো; দেখি।

তাহার পর টো টো করিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া পাঁজি পুঁথি উল্টাইয়াও যখন অকালে মন্ত্র দিবার বিধি মিলিল না, তখন সহাস্যমুখে স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "আজ আমার আশ্রমে থাকো, কাল আমি তোমায় মন্ত্র দেবো, তারপর শুভদিনে অনুষ্ঠানাদি সেরে নিলেই হবে।" পরদিন নর্ম্মদায় স্নানান্তে "ওঁ হ্রীং ক্রীং"—ইত্যাদি যুক্ত এক লম্বা শক্তিমন্ত্র কাণে পাইয়া দ্বিপ্রহরে সাধের বাঙলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। যাত্রাকালে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলে দেখিলাম বাবার চোখে জল; তিনি কাঁধের গৈরিক উত্তরীয় দেখাইয়া বলিলেন, "এটা নেবে?" আমি গৈরিক লইতে রাজী হইলাম না, কি জানি কেন যেন এতকালের এত সাধের গৈরিক লইতে গিয়া এখন আমার মন বেঁকিয়া বসিল; হাত উঠিল না। সকালে বাবা মন্ত্র দিবার কালে উপদেশ দিয়াছেন মাছ, মাংস, পেঁয়াজ ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ ত্যাগ করিতে। দ্বিপ্রহরে আহারে বসিবার

পূর্ব্বে আড়ালে ডাকিয়া সস্নেহ-হস্ত কাঁধে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা পেঁয়াজ খাওগে? মেরা কোঠরিমে ছিপায়কে ভুঁজয়োয়ায় দে?" সর্ব্বত্যাগী মুক্ত পুরুষের এ হৃদয়ের বন্ধন দেখিয়া আমারও চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল!

সেই দিনই চান্দোত হইতে মাণিকতলার বাগানের দুর্দ্দমনীয় টানে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন আমার জনৈক বন্ধু থানার উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী। তাঁহার বাসায় দুই এক রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। লেলে বলিয়াছিলেন, "নির্জন ঘরে দুয়ার দিয়া ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যজ্ঞান লইয়া সপ্রেমে ধ্যান করিবে। ভাবিবে, এত কাছে সে-রূপ দাঁড়াইয়া আছে যে হাত বাড়ালেই পাও।" তাহাই করিতে গিয়া প্রথম দিনই সাধন খুলিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার আরম্ভ হইল, হঠাৎ ভয়ে কণ্টকিত দেহে আমি একদৌড়ে একেবারে বন্ধুর বৈঠকখানায়! একটা "হাঁ হাঁ কি কি" রব পড়িয়া গেল, আমি যাহা হউক একটা কৈফিয়তে ব্যাপারটা ঢাকিয়া লইলাম। তাহার পর লেলের সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করিয়া, সাধনার স্পষ্ট ইঙ্গিত লইবার আশায়, তাঁহাকে পত্র দিয়া থানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, লেলে কিন্তু পরদিনও আসিলেন না। তখন আমি বান্দরায় অনারেব্‌ল ভাণ্ডারকরের বাসায় লেলের সন্ধানে আসিয়া শুনিলাম, লেলে আমারই উদ্দেশ্যে থানায় গিয়াছেন। সে যাত্রা গুরু-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, আমি মনে সন্দেহ, দ্বিধা, ভয়, আনন্দ, বিস্ময় লইয়া অগত্যা শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে ফিরিলাম।

সেই হইতে বাগানে নিত্য ধ্যানে বসিতে লাগিলাম। গাছ পালার মধ্যে ধ্যান করিতে গিয়া সমস্ত দেহে রোমাঞ্চ হইত, মনে হইত জগৎ চরাচর যেন সজীব চেতন, যেন কি এক মহাচৈতন্য আমায় সহস্র নেত্রে দেখিতেছে। তখন কিন্তু সমস্ত মনটা ভয়ানক একটা কাণ্ড বাধাইবার আশায় দেশের কাজে পাগল, ধ্যানে বসিয়াও মন টিঁকিত না। কলিকাতায় তখন আমার সেজদাদা অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ও বন্দেমাতরম্ কাগজের কর্ণধার। আমি তখন মাণিকতলার

বাগানে বোমার কারখানা খুলিয়াছি, কাজেই সার্পেণ্টাইন লেনে তাঁহার কাছে কদাচিৎ যাইতাম। চান্দোত হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে লেলের আশ্চর্য্য শক্তির কথা বলিলাম। তাহা শুনিয়া সেজদাদা আমায় বলিলেন, যেন অবসর জুটিলে তাঁহার সহিত লেলের দেখা করাইয়া দিই। অবসর ভগবান আপনি জুটাইলেন। ঘটনাচক্রে সুরাটের কংগ্রেসের দিন ঘনাইয়া আসিল। তখন তলে তলে বাঙলার ও পুণার গরম দল দক্ষযজ্ঞ নাশের আয়োজনে সাজিতেছে। বাঙলার জেলা হইতে, ভারতের দেশ দেশান্তর হইতে বাছা বাছা ডেলিগেট গাড়ি ভর্ত্তি হইয়া সুরাটে প্রেরিত হইতেছেন। অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন সংযোগ। আমা হেন বনবিড়ালের ভাগ্যেও শিকা ছিঁড়িল, আমার মাসতুতো ভাই সুকুমার য়্যান্টি-সারকুলার সোসাইটির কর্ণধারদের একজন, আমায় না জিজ্ঞাসা করিয়াই হঠাৎ দেখি য়্যান্টি-সারকুলার সোসাইটি আমায় ডেলিগেট নির্ব্বাচন করিয়াছে। আমায় বাছাই করিল নরম দল, আর গরম দলের পয়সায় আমি অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর বাবুর সহিত সুরাট যাত্রা করিলাম।

জীবনের কোথাকার জল যে কোথায় গড়ায় মানুষ সত্যই তা' জানে না। কে যেন জীবনের দাবার গুটি পর্দ্দার আড়াল হইতে কমলহস্ত বাহির করিয়া কখন অলক্ষ্যে টিপিতেছে আর আমরা কখনও পঞ্জা ছক্কা পাইয়া কখনও চালমাৎ হইয়া নাস্তানাবুদ হইতেছি। তখন জানি দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহ করিব, হয় ফাঁসী-কাঠে কোন শুভপ্রাতে তুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে হইবে, নয় বাঙলার মসনদে বুঝি বা গভর্ণরি পাইয়া তু'শো মজা লুটিব! বিধি কিন্তু তখন হইতেই এই সুরাট যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া শুধু আমার নয়, সেজদাদা অরবিন্দের জীবনের গতিও ভাগবত জগতের দিকে ধীরে ধীরে ফিরাইতেছিলেন। আমার বাসনার পঙ্কের বুকে ভগবানের কমল যে আঁধার রজনীর নিবিড় স্পর্শে ঢাকিয়া ফুটাইয়া তুলিবে, সেই রজনী ঘনাইয়া আসিতেছিল, আর আসিতেছিল এক মহাপুরুষের রূপান্তরকরা স্পর্শ। আমি সজ্ঞানে

যাইতেছিলাম, আমার কামনার গড়া স্বর্ণসৌধ লঙ্কাপুরীর সিংহদ্বারে চক্ষু রাখিয়া, কিন্তু বিধাতা আমারও অজ্ঞাতে আমার চরণগতি লইতে-ছিলেন তাঁহারই কুঞ্জদুয়ারে। জগতে হয় তাই, এ যাহার দুনিয়া, সেই-ই আপন মনে ভাঙে গড়ে, আর মানুষ কাণা ভোমরার মত ভাবে তাহারই গুণ-গুণানীর ফলে বিশ্বের উপবনে এত ফুল, এত মধু। আসল কর্ত্তাকে কেউ দেখিতে পায় না, হাজার হাজার মেকি কর্ত্তার ভিড়ে সবাই দিশাহারা। যাহাকে কিন্তু সে একবার ছোঁয়, তাহারই চোখের পর্দ্দা উঠিয়া যায়—তখনই 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্ তস্যাং-জাগ্রতি সংযমী'।

৩

সুরাটে দক্ষযজ্ঞ-নাশের পালা

আমি যে সুরাটে কংগ্রেস দেখিতে যাইব ইহা এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপার। কারণ আমাদের গুপ্তসমিতির অনেক নিয়মের একটি প্রধান নিয়ম এই ছিল যে, কোন কর্ম্মী কোন রাজনীতিক ব্যাপারে বা প্রকাশ্য সভা সমিতির বাগ্‌বিতণ্ডায় কদাচ যোগদান করিবে না। যত কম মানুষ তাহাদের চেনে, যতই তাহারা লোকচক্ষুর অগোচরে চলে ফিরে, ততই এ কাজের সুবিধা। এই জন্য অত বড় স্বদেশী আন্দোলনের হাজার হাজার সভা সমিতির কোনটিতেই আমাদের কেহ যায় নাই, এমন কি দাগী হইবার—পুলিশের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা এড়াইতে আমরা—যত বিপ্লবপন্থীরা—বিদেশী জিনিসই বরং ব্যবহার করিতাম। অসির মুখে যে দেশ হারাইয়াছি তাহা অসি-হস্তেই জয় করিতে হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা স্বদেশী আন্দোলনকে বৈশ্যের আন্দোলন বলিয়া উপহাস করিতাম। কোন রকম বক্তৃতা বা উত্তেজনা ছিল এই সমর্পিত-জীবন নীরব-কর্ম্মীদের দুই চক্ষের বিষ। তবু সুরাটে কংগ্রেস দেখিতে গেলাম কেন?

আমি যে সুরাটে যাইব তাহা আমি সেদিন সকাল অবধি জানিতাম না। হঠাৎ কে যেন আসিয়া বলিল, “তোমার টিকেট কেনা হইয়াছে, তুমি য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির ডেলিগেট।” শুনিবামাত্র আমি একটি ক্যানভাস ব্যাগে আমার তল্পিতল্পা অর্থাৎ খানকতক ধুতি ও পিরাণ লইয়া যাত্রা করিলাম। কারণ অনেক দিন হইতে মাথার মধ্যে একটা সংকল্প গজাইয়াছিল যে, সমস্ত ভারতের যত

বিপ্লব কেন্দ্রগুলিকে একসূত্রে গাঁথিতে হইবে। তখন পুণা বোম্বাইয়ের বিপ্লব-নেতারাই বাঙলার কর্ম্মীদের মানস আদর্শ, সবাই জানি—মহারাষ্ট্র প্রস্তুত, কেবল বাঙলার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, বাঙলা না উঠিলে, উঠিবে না। তাই মনে মনে ভাবিতাম, "ওরা এমনই প্রস্তুত হইয়া আছেই যদি, তবে আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে না কেন?" এই সুযোগ পাইয়া মনে হইল, "সুরাটে অনেক নেতাই তো একত্র হইবেন, সেই সময়ে সবাইকে ডাকিয়া একটা নিখিল ভারত বিপ্লবপন্থীর পঞ্চায়েত বসাইতে হইবে। দেখি স্যাঙাৎরা কে কত দূর তলোয়ার কিরিচ শানাইয়াছে!"

বোম্বে-মেল খড়্গপুরে আসিয়া থামিল। ভিড়ে যে যেখানে পারিয়াছি উঠিয়াছি। সেই পথটুকুই আসিতে আমায় শীত ও ক্ষুধা দুই-ই ভীম বিক্রমে চাপিয়া ধরিল। এমন সময় অরবিন্দ তাঁহার গাড়ীতে আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, গিয়া দেখি সেটাও তৃতীয় শ্রেণী, ভিতরে নরক গুলজার। অনেক রাজনীতিক ভবঘুরেই সেখানে জুটিয়াছেন, কে কে তাহা এখন আর স্মরণ নাই। শ্যামসুন্দর বাবু আমার শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া নিজের গরম ওভার-কোট আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন ও সামনে একঠোঙা অমৃতোপম জলখাবার আনিয়া ধরিলেন। বলা বাহুল্য সেই হইতে প্রসাদ-লোভী আমি তাঁহাদের গাড়ীতেই রহিয়া গেলাম। মাঝে যেন কোথায় কোন্ ষ্টেসন হইতে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রতি ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য, প্রতি ষ্টেসনে ফুলের মালা, লুচি মণ্ডা মেঠাই ও চা! বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে কানে তালা লাগিয়া গেল, আর চা জলখাবার খাইতে খাইতে সকলেরই পেট হইল ঢোল। অনেক ষ্টেসনে বহু লোক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, অরবিন্দের সাক্ষাৎ, প্রাণ ভরিয়া বড় একটা কেহই পায় নাই। কারণ সবারই ধারণা ছিল যে, দেশের একটা এতবড় গণ্যমান্য মানুষ, নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীতেই অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিতেছেন। কাজেই প্রথম শ্রেণী হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে, এই

ক্ষীণজীবী নিরীহ মানুষটিকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে করিতে, এদিকে ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়া যায়। আমাদের তো রাত্রে নিদ্রা নাই, পেটে স্থান নাই, সেজদার গলার মালায় গাড়ী বোঝাই!

বোধহয় নাগপুর আর অমরাবতীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য নামিতে হইয়াছিল। সেখানে অরবিন্দের বক্তৃতা হইল, কিন্তু বক্তৃতা-স্থানে লোক-সমুদ্র ঠেলিয়া যায় কার সাধ্য! তখন সবে সাতশ'· বছরের ঘুম ভাঙিয়া এ পোড়া কুম্ভকর্ণের দেশ জাগিতেছে। প্রথম নেশায় সবাই পাগল, নাচিয়া কুঁদিয়া হল্লায় আকাশ ফাটাইয়া কি যে করিবে, মানুষ ঠাহর করিতে পারিতেছে না। সেজদাকে ধরিয়া যেখানে লইয়া বসাইয়া দেয়, নীরব মানুষটি সেইখানেই বসিয়া থাকেন, আর সবাই নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। অতবড় জনসঙ্ঘে তাঁর বক্তৃতা বড় বেশী দূর শোনা যায় না, তবু সহস্র সহস্র মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নিজের উচ্চ-পদ, মান, সম্ভ্রম ছাড়িয়া জাতীয় পরিষদে সামান্য মাহিনায় দেশের সেবা করিতে আসিয়াছে, সে কেমন মানুষ! বন্দেমাতরমের অগ্নিমন্ত্র দিয়া সাতশতাব্দীর এত বড় অচল জগদ্দল পাথর নাড়িয়া এই পাষাণে ভাব-গঙ্গা বহাইতেছে, সে কেমন জন! তাই দেখিতেই স্থানে স্থানে এত ভিড়! তখন ভারত বহুযুগ পরে আবার প্রথম ত্যাগের মহিমা বুঝিয়াছে, ইতিমধ্যেই মেদিনীপুরের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে এত দিনের নিত্য পূজার মাটির ঠাকুরগুলি বিসর্জ্জন হইয়া চুকিয়াছেন—পুরাতন নেতাদের প্রায় অন্ন উঠিয়াছে।

তাহার উপর রণচণ্ডী আসিবেন কিনা—তাই তাঁহার পদভরে তখন এত পূর্ব্ব হইতেই ধরা টলমল, মানুষও উন্মনা ও চঞ্চল; পায়ের তলা হইতে এতদিনকার সুখের আশ্রয় জীবনের ভিত নড়িয়া যাওয়ায় সকলেই তখন পুরাতনে অবিশ্বাসী ও নূতনের জন্য সকল কিছুই ভাঙিয়া ধ্বসাইয়া নবীনের ভিত গাড়িতে ব্যস্ত। সবাই যেন একটি কুঠার-হস্ত মারমুখী পরশুরাম। বোম্বাইয়ে গিয়া কাহার বাড়ী ছিলাম এখন

আর মনে নাই। সেখানে গৃহস্বামীর কোন তরুণ আত্মীয় আমায় একটি অভিনব প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, আপনাদের দেশে পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার হয় কেন? আমাদের দেশে কখন ওরকম ব্যাপার হতে শুনেছেন? এই একটু আগে দেখলেন হু' তিনটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার বোন ষ্টেসনে গেলেন, সঙ্গে পুরুষ মাত্র নেই, নিজেরাই টিকিট করবেন, নিজেরাই মাল-পত্তর সামলাবেন। আমার বোধহয়, অবরোধে বহু যুগ বন্ধ রেখে, পরপুরুষকে ভয়ের সামগ্রী বলে দেখতে শিখিয়ে, আপনারা ঘরের মা বোনকে এমন অসহায় নিঃশক্তি করে ফেলেছেন যে, বিপদে আততায়ীকে আক্রমণ করা দূরে থাক, তাঁরা আত্মরক্ষাও করতে পারেন না।" কথাটা এতদূর সত্য যে নিতান্ত অপ্রিয় ও অরুচিকর হইলেও আমায় প্রায় নীরবে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হইল। না মানিয়া করি কি? আমাদের দেশের পুরুষ ও নারী সাঙ্খ্য-পুরুষ ও সাঙ্খ্য-প্রকৃতি, একজন খোঁড়া ও ঠুঁটো, আর একজন কাণা। পাছে নারী পথ দেখিয়া চলে, তাই খোঁড়া আপন শক্তিকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া অন্ধ করিয়াছে। তাই এদেশের শক্তি রাঙতার তলোয়ার, সে অসি কাটে না, মজায়। বঙ্গের নারী মৃন্ময়ী দেবী, পুরুষের ইঙ্গিতে তাহারই কামনার পুতুল ঘুরে, ফিরে, চলে, বলে। অন্দর, পর্দ্দা, ঘোম্‌টা, মূর্খতা, বাল-মাতৃত্ব আর রোগের সপ্তপাকে বাঙালীর মেয়ে জীবন্মৃতা।

তাহার পর সুরাট। সে এক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড। নবজাগ্রত ভারতের সে সফল স্বপ্নছবি ভুলিবার নয়! ষ্টেসনের কাছে কংগ্রেস-ক্যাম্পের সন্নিহিত মডারেট শিবির, সকলগুলিই তাঁবু ও সাহেবী কেতায় সাজান। সুরাট নগরীর মাঝখানে কতকগুলি দেবমন্দির ও বাড়ী জুড়িয়া বিশাল ন্যাশনালিষ্ট ক্যাম্প। এখানে পাঁচ টাকার টিকিট কিনিলে কংগ্রেসের কয়দিন চব্য চোষ্য আহার মিলে, জাতি-বিচার ছুঁত-মার্গের এখানে নাম গন্ধ নাই। অরবিন্দের স্থান একটি

মন্দিরে, সে ঘরে তাঁহার আশে পাশে এমন কি ক্যাম্প খাটের নীচে অবধি মানুষ শুইয়া থাকে।

তিলকের স্থান আর একটি মন্দিরে, সেখানে তিলক ও অরবিন্দ বসিয়া আপনাদের কাজ কর্ম্ম করেন। আর সহস্র সহস্র জনস্রোত সকাল হইতে রাত একটা অবধি, এক সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া শুধু দর্শন করিয়া অপর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়। মডারেট লিডারদের পাইতে হইলে কত সুপারিশ ধরিয়া কার্ডবাজী করিয়া দেখা করিতে হয়, এখানে অবারিত দ্বার; একদিন আহারে বসিতে গিয়া দেখিলাম, তিলকের পাশে এক পঙক্তিতে বসিয়াছেন চিদম্বরম্ পিলে, হায়দর রেজা, অরবিন্দ আরও কত কে। ভারতের এমন প্রদেশ নাই যেখানকার হিন্দু-মুসলমান সে পঙক্তিতে নাই!

অরবিন্দ, তিলক, খাপার্দ্দে, মুঞ্জে প্রভৃতি নেতাদের ভিতরে ভিতরে কি পরামর্শ হইত আমি জানিতাম না, কারণ আমি থাকিতাম আপনার তালে। তখন সর্দ্দার অজিত সিং, সুফি অম্বাপ্রসাদ প্রভৃতির খুব নাম, কারণ তাঁহারা সবে দেশান্তরী দশা হইতে লালা লজপৎ রায়ের সহিত মুক্তি পাইয়াছেন। আমি অজিত সিংএর সহিত নিজে গিয়া পরিচিত হইলাম, বহু অন্বেষণে দুই তিন জন মহারাষ্ট্র বিপ্লব-নেতার সন্ধান পাইলাম। তাঁহারা নিরীহ ডেলিগেট সাজিয়া কংগ্রেসে তামাসা দেখিতে আসিয়াছেন। আমাদের গুপ্তচক্র বসাইবার সব বন্দোবস্তই করিয়া তুলিলাম। বরিশালনেতা শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবুর সহিত প্রায়ই দেখা হইত, তিনি জানিতেন না আমি কি বিষম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি! বাল্যকালে দেওঘরে আলাপ হওয়ার পর হইতে তিনি আমায় বড় স্নেহ করিতেন। মাদ্রাজের দুই একজন গুপ্তচক্রের নেতাও সেবার এই কঙ্গরসী ব্যাপারে সুরাটে জুটিয়াছিলেন।

৪

প্রথম দফা ভূতের কীর্ত্তন

প্রথম দিন গণ্ডগোল আরম্ভ হইল সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া। মেদিনীপুরে বাঙলার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়াই ঝড় উঠিয়াছিল, এখানেও হইল তাহাই। সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিবা মাত্র "শেম্ শেম্, দেশদ্রোহী" ইত্যাকার রব উঠিল, তাঁহার বক্তৃতা কেহ শুনিবে না, তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে, এই হইল গোঁ। বঙ্গের এত দিনের রাজনীতিক দুলাল, অসপত্ন্য-নেতা সুরেন্দ্রনাথ কখনও লোকমতের কাছে মাথা নীচু করিতে শিখেন নাই, তামস অন্ধ দেশের তিনি ছিলেন রাখাল রাজ, এতদিন লাঠি হাতেই গরু চরাইয়াছেন। আজ দেশ গোজন্ম ঘুচাইয়া মানুষ হইতেছে, আজ সুরেন্দ্রের উপর গরম দলের অন্ধরাগ। কংগ্রেস মণ্ডপ ভরিয়া মুহুর্মুহু শৃগাল ধ্বনির জ্বালায় সুরেন্দ্রনাথ তো বক্তৃতা দিতে পাইলেনই না, উপরন্তু কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত বাঙলার প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার বাটিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন, উদ্দেশ্য এই যে, সেইখানে বুঝাইয়া পড়াইয়া বাঙলাকে একমত করিতে পারিলে অন্যান্য প্রদেশ বাঙলার রায় মানিয়া লইবে।

সে এক অদ্ভুত মিলন। সবাই সেখানে উন্মনা, উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যস্ত-সমস্ত; সবারই যেন একটা কি হারাইয়া গিয়াছে, যেন বেশ লয় তালে বাঁধা সঙ্গতে কোথায় হঠাৎ চড়াং করিয়া তার ছিঁড়িয়াছে, সকলের স্বস্তি আরাম ভাঙিয়া আসর মাটি করিয়া দিয়াছে। সেখানে সুরেন্দ্র-

নাথ ছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ, আশু চৌধুরী, অম্বিকাপ্রসাদ মজুমদার ছিলেন, আরো যে কত জন ছিলেন—"অযুত ভকত গোরার নাম নিব কত ?" এদিকে গরম দলেরও ছিলেন অরবিন্দ, মতিলাল, অশ্বিনী দত্ত, শ্যামসুন্দর আদি রথীর দল। এই দুই দলের মধ্যে নরম দল ধাপ্পা দিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া কোন গতিকে নিজের মত, বিনা পণে বজায় রাখিতে ব্যগ্র ও গরম দল উদাসীন। নরম দল তখনও বুঝেন নাই যে, ইহাদিগকে উদরস্থ করিয়া মিলন তাহা আর হইবার নয়।

যখন সকলে জুটিয়াছেন তখন হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন কক্ষ হইতে সেখানে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এহ, Scandalous, shameful! Isn't it! এসো, এসো সব মিটমাট করে ফেলো। আমরা বাঙলা একত্র থাকলে ওরা করবে কি ?"

অনেক বাকবিতণ্ডা করিয়া ও যুক্তি তর্ক অনুনয় বিনয়ের পালা গাহিয়াও কিন্তু আসর আর জমিল না। সুরেন্দ্রনাথের আদেশে অম্বিকাবাবু একটা কাগজে কি মিলনসূচক অঙ্গীকার লিখিয়া সকলকে দস্তখৎ করাইতে সকলের কাছে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা পড়িয়া এ বলে "ওঁকে দেখান," ও বলে "উনি যদি সই করেন, দেখুন গে" ইত্যাদি। সেইখানে মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আমার মত কয়েকজন গুপ্তচক্রী যুবকের সহিত, মজা দেখিয়া দেখিয়া পায়চারী করিতেছিল, এ সেই সত্যেন্দ্র, যে পরে আলিপুর মোকদ্দমায় কানাইলালের সহিত রাজার সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলি করিয়া ফাঁসী যায়। অম্বিকাবাবু কাছে আসিতেই সে বলিল, "দেখি মশাই, আমায় দিন, আমি সই করছি।" যাঁহাতক তাহার হাতে দেওয়া, তাঁহাতক ছিঁড়িয়া তাল পাকাইয়া কাগজখানি হাতে হাতে উধাও। অম্বিকাবাবু সুরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়া পাকা দাড়ী নাড়িয়া উগ্রচণ্ডারূপে নালিশ জুড়িয়া দিলেন। ফলে মিলন-উৎসব ভাঙ্গিয়া গেল। যখন সে বাটী হইতে অরবিন্দের পশ্চাতে আমরা বাহির হইতেছি, তখন একজন হোমরা-চোমরা খুব বড় মদরৎ-নেতা হাত নাড়িয়া বলিতেছেন, "অরবিন্দ ঘোষ,

তিলকের গু খাও, গু খাও।" আমি তো অবাক্! এ যে কুরুচির জোরে vulgarityতে মেছোহাটাকেও হার মানাইল। আজ তিনি ইংলণ্ডে ও ভারতের রাজ-দরবারে খুবই উচ্চপদস্থ ও ডাকসাইটে মানুষ, নাম করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া আমার আর কি লাভ হইবে? দলের খাতিরে মানুষ যে কতখানি অসংযত হয়, ইহা তাহারই একটু নমুনা। সে রাত্রে উত্তেজনার স্রোতে গরম পাড়া টলমল; কাল আবার কংগ্রেসে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এত দিন পর জাতীয় জীবনের ঘাটে-বাঁধা বজরায় মাঝ-দরিয়ার তুফানী ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। দড়ি দড়া ছিঁড়িয়া বজরা আজ ঝড়ের মাতাল তরঙ্গে; পাল নাই, গুণ নাই, দাঁড় নাই, হাল নাই, আছে শুধু জোর বাতাস, পাগল ঢেউ আর কূলহীন পথ। শুধু অনির্দ্দেশ যাত্রারই আজ আনন্দ, বাঁধা ঘাটের আওতা ও আটকের মরণ কাটানোই আজ জীবন; বিপুল অকূল জলরাশির কোন দিকে কূল আছেই, ঢেউ কাটাইয়া ভরা জোয়ারের এই টান, এই প্রমত্ত গতিই শরণ করিয়া চলিলেই কূল মিলিবেই মিলিবে, এই তখনকার গরম দলের মন। তাঁহাদের একটা লক্ষ্যও ছিল, কিন্তু দূরে—স্বপ্নপুরীর কোলে; চোখের কাছে ছিল এত যুগের মোহের শৈবাল, মরণের পঙ্ক ও পুরাতনের পাথর; এইসব বাধা কাটাইয়া একবার স্রোতে পড়াই তখন কাজ, ধ্বংসই তখন মন্ত্র। সবারই কাঁধে দক্ষযজ্ঞনাশী পিনাকীর এক একটি দানা সওয়ার হইয়াছে, সবাই পুরাতনের কালাপাহাড়, নূতনের নেশাখোর নবাস্বাদিত শক্তি-সুরার মাতাল। এইটি সে যুগের বিধাতার ইঙ্গিত, সে যুগে যে তাহা বুঝিয়াছিল, সে কাজ করিয়াছিল, যে বুঝে নাই সে বাধা দিয়া শক্তির স্ফুরণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া কংসের মরণ মরিয়াছিল। যাঁহারা গরম দলে থাকিয়া আসর গরম করিতেছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই বুঝেন নাই ব্যাপারটা কতদূরে গড়াইবে। তবে কেহ কেহ জানিতেন এবং অগ্নিকাণ্ডই চাহিতেন, তাঁহারা গোপন আগুনের ইন্ধনও জোগাইতেন আর বাহিরের বাঁধনের পাথরও সরাই-

তেন ; এ ধারার মানুষ কিন্তু মুষ্টিমেয়, তাহাদের মাঝে আবার গুটি-কয়েক মাত্র ভিতরের খবর রাখিতেন, আর আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আগুন লইয়া খেলা করিতেন। আমরা ধরা পড়িবার বছর খানেক আগে হইতে ইহাদের তিন জন আমাদের দেশব্যাপী বিপ্লব-যজ্ঞের নেতার সহিত একযোগে কেন্দ্রমণ্ডলী (inner circle) হইয়া নেতৃত্ব করিতেছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে ইঁহাদের কেহই সুরাটে যান নাই, সুরাটে যাঁহারা এতদিনের মোড়লতন্ত্রী কংগ্রেস ভাঙিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন রণচণ্ডিকার অন্ধ ক্রীড়নক, মায়ের নৃত্যের শ্মশান মায়েরই মায়ার কুহকে মোহাবিষ্ট হইয়া রচিয়া দিতেছিলেন মাত্র। আমরা যেখানে লোক পটাইতে মিশন কাজে (mission work) যাইতাম, সেইখানেই আমাদের প্রধান কাজ ছিল কংগ্রেসী রাজনীতির ভূয়া চালটি ধরাইয়া দেওয়া, এ দুষ্কার্য্য আমরা নিয়মিত মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, জেলায় জেলায়, মিশনারী বা প্রচারক পাঠাইয়া করিয়াছিলাম, ১৯০৩ হইতে এই সুরাটী যজ্ঞনাশী বৎসর অবধি সমানে করিয়াছিলাম। তাহারই ফলে শিক্ষিত-সমাজের তরুণ দল ও তাহার নূতন নেতৃগণ এই কঙ্গরসের অরসিক ও রসভঙ্গকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, হুগলী, কলিকাতা, গৌহাটী, রঙ্গপুর, বাঁকুড়া আদি জেলার বহু চিন্তাশীল উদ্যোগী ও উদীয়মান নেতা আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাতিয়া অগ্নিবৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন! আমাদেরই প্রচারের ভাববন্যায় স্বদেশীর জন্ম, আমাদেরই প্রচারের উত্তেজনায় কংগ্রেস যজ্ঞ নাশ। আমাদের সঙ্কেতে দেখানো মরণভীষণ পথে মুষ্টিমেয় অসম সাহসী ভাবুক মাত্র গিয়াছিল, জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া ধরিয়াছিল the line of least resistance—সহজ সরল ভাঙনের রাজপথ।

দ্বিতীয় দিনের পালা

এদিকে আমাদের চক্রের আয়োজন হইতেছে আর ওদিকে কংগ্রেসের মহাতাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন কংগ্রেস বসিবামাত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা লইয়া গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অরবিন্দকে ঘিরিয়া বাঙলার দশ বারজন যুবক আমরা বঙ্গদেশের নির্দ্দিষ্ট ব্লকের আসনে বসিয়াছিলাম। আশে পাশে আরও অনেক বাঙালী, কেহ বা মডারেট, কেহ বা গরম দলের, চ্যানাচুর ঘুঘনিদানার মত সবাই পাঁচমিশেলী ভাবেই বসা হইয়াছে। পিছনে কাতারে কাতারে মহারাষ্ট্র ডেলিগেট, সবার হাতে ছোট ছোট লাঠি। সামনে সভাপতির বেদী, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, মেটা, গোখলে, তিলক প্রভৃতি সমাসীন। চুনোপুঁটির মধ্যে সেখানে বেদীতে অধিকাংশই পার্শী। আমরা দেখিলাম তিলক কি বলিতে উঠিলেন, কিন্তু কেহ কিছু শুনিলেন না ; তিলককে উপেক্ষা করিয়া আপন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই দিন সকালে বা পূর্ব্ব-দিন রাত্রে তিলক সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সংশোধন করিবার নোটিশ দিয়াছিলেন। মডারেট কর্ম্মকর্ত্তার দল তাহা পাইয়াও প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই বা উত্তর দেন নাই, আজ বলিলেন, "নোটিশ দেওয়া হয় নাই, তোমার কথা শুনিব না।" একজন উঠিয়া শ্রীযুত রাসবিহারীকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলেন, অমনি গরমদলের আটশ' ডেলিগেট সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তিলকের কথা শোন, আগে তিলকের কথা শোন।" পূর্ব্বের কোন কংগ্রেসেই এত

ডেলিগেট হয় নাই, সভাপতির প্রস্তাবে ভোট দিয়া কংগ্রেসে ভোটের জোরে নিজেদের সভাপতি নির্ব্বাচন করানই ছিল গরমদলের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে গাড়ী গাড়ী ডেলিগেট সুরাটে চালান হইয়াছিল, সাতদিন হইতে দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া "সাজ সাজ" রবে ঘুমন্ত সুরাটকেও জাগাইয়া তোলা হইয়াছিল।

আমরাও সব সাজিয়া গুজিয়া গিয়াছি, সবারই হাতে মোটা বেতের ছড়ি। কি জানি যদি ঘা কতক খাইতে হয়, তখন ঋণ রাখিয়া আসাটা তো আর ভাল দেখাইবে না। সেদিন পাণ্ডালে ঢুকিয়াই দেখা গিয়াছিল নীল উর্দ্দি পরা, ভাড়া করা খালাসী গুণ্ডা, মণ্ডপখানি ভিতর-দিক দিয়া বেড়িয়া আছে। আজও পূর্ব্ববৎ রাসবিহারীর নাম সভাপতিরূপে উত্থাপন করা হইল। অমনি তিলক উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার কথা কে শোনে? জনে জনে উঠিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় দফা এই প্রস্তাবের পোষকতা করিতে লাগিলেন। বার বার আদেশ সত্ত্বেও তিলক বসিলেন না, বলিলেন—"আপনারা আমার এই amendment না শোনা অবধি আমি এমনি দাঁড়াইয়া থাকিব।" মদ্দ-পুরুষ হাত গুটাইয়া অচল পর্ব্বতবৎ খাড়া রহিলেন, আর মণ্ডপ মুখরিত হুঙ্কারবের মধ্যে সভাপতি নির্ব্বাচিত পরিগৃহীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। গণ্ডগোল থামাইবার জন্য তাহার পর যে অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহার মত প্রহসন কোন রঙ্গমঞ্চে কখন দেখি নাই। বৃদ্ধ সভাপতির মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনি, মাঝে মাঝে লিখিত বক্তৃতা পাঠের ব্যর্থপ্রয়াস আবার ঘণ্টাধ্বনি ও জোড়হাতে মূক কাকুতি মিনতি। পনর মিনিট ধরিয়া এই লজ্জাকর ব্যাপার চলিল, পনর মিনিট ধরিয়া শিয়াল, কুকুর, ষাঁড়, বিড়াল, ময়ূর, মুরগীর ডাক চারিদিক হইতে উঠিয়া এই প্রহসনের সম্বর্দ্ধনা করিল। আজ তিলক বলিতে উঠিলেও নরম দলের পার্শী সভ্যরা এইরূপ কোলাহল করিয়াছে, এখন একে একে সভাপতি, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সবার বেলায়ই গরমদলের আট শ' ডেলিগেট ও দর্শকদল তাহার চতুর্গুণ কলরব করিয়া ছাড়িল।

হঠাৎ একজন পার্শী যুবক একখানা বেন্টউড-চেয়ার তুলিয়া তিলককে মারিতে উঠিল। আর যাইবে কোথা! গ্যালারী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মার মার রবে দক্ষিণী যুবকের দল বেদীর দিকে চলিল, তাহার আরম্ভেই কোথা হইতে একপাটি নাকবাঁকানো মারাঠী নাগরা সাঁই করিয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথের মাথা ঘেঁসিয়া ছিটকাইয়া মেটার ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সেই নাগরাখানা হইল বারুদে দেশলাই কাঠি, "কাণের নিকট দিয়া মরমে পশিয়া" সেই কুচক্রী নাগরাখানাই সেবার কংগ্রেসের যবনিকাপাত করিয়া ছাড়িল।

আমি তখন নীরব শান্ত অরবিন্দের পিছনে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছি। তেমন নরদৌড় আর জীবনে কখন দেখি নাই, বোধহয় আর কখন দেখিবও না। সুরেন্দ্র ছুটিতেছেন, গোখলে ছুটিতেছেন, মেটা ভূপেন্দ্র যে যার চৌকি ছাড়িয়া এ-দুয়ার ও-দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছেন। এদিকে ঘেরা খোঁয়াড়ে স্ত্রী-দর্শকেরা মিহিসুরে আর্ত্ত চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছেন। কে কাহার খোঁজ রাখে? সত্যেন্দ্র ও আমি আরও সাত আটজন বাঙ্গালী যুবককে লইয়া অরবিন্দকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছি। যখন তিনি ধীর পদে মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন বেদীর নিকট হইতে যাইবার সময় উপর হইতে পার্শী যুবক একজন তাঁহার উদ্দেশে থু থু ফেলিল। তখনকার মত দলাদলি এখন আছে কি না সন্দেহ, তখন দলের জন্য মানুষ এত হীন হইত যে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। কারণ তখনও গোমাংসের মত বিলাতী পলিটিক্স ভারতবাসীর পেটে বদহজমের উদ্‌গার তুলিতেছিল, রাজনীতি কূটনীতি হইতে পারে কিন্তু দুর্নীতিও যে হয় তাহা পাশ্চাত্যই জগতকে শিখাইয়াছে।

কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল, গরমদল নিজেদের আলাদা convocation বসাইয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন, মডারেটরা প্রাণের দায়ে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া সভা করিলেন ভাঙ্গা কংগ্রেস মণ্ডপে, আর তাহার নাম দিলেন 'জাতীয় মহাসভা'। রাসবিহারী বাবুর সভাপতির

সম্ভাষণ এদিকে কলিকাতায় ছাপা হইয়া পথে পথে বিক্রয় হইতেছে, সবাই জানে সভাপতির বক্তৃতাই দুই পয়সা দামে পড়িতে পাইতেছে। ওদিকে যে মূলে হাবাৎ, সভাই হয় নাই, পতি বিবাহের আগেই 'নষ্ট পতিত প্রব্রজিত' সে সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ-বৎ আসিয়া পঁহুছিল পরে। এত কালের বড়দিনের সখের আড্ডা জীবন্মৃত কংগ্রেস আজ মরিয়া বাঁচিল, অবশ্য এই মরণটা সহসা সকলে স্বীকার করিল না। কেহ বলিল মরিয়াছে 'ঠিক', কেহ বলিল, 'উহুঁ! আমরা থাকিতে মারে কে?' কেহ বা বলিল, 'দেখা যাউক।' কয়েক বৎসর কিন্তু বেঙ্কুড় বামনাকার মহাসভা দানোয় পাওয়া মড়ার মত পড়িয়া পড়িয়াই ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। এসব কিন্তু পরের ইতিহাস, তখন যাহা হইল তাহা বলি।

৬

গুপ্ত চক্র

এবারের এই বার তেরশ' কোপন দুর্ব্বাসার বৈঠকে সরকারী তরফ হইতে শান্তিরক্ষার জন্য যে পুলিশ মোতায়েন ছিল তাহাদের মাথা ছিলেন একজন আইরিশ। এক এক জন নেতা হুড় মুড় হুড় হুড় শব্দে প্রাণপক্ষী হাতে করিয়া বাহির হন, আর গাড়ি-বন্দী করিয়া কনষ্টেবল ঘিরিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে চালান দেন। প্রথমটা কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, রব উঠিল, "তিলক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।" তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে যখন তিলক আদি নেতৃবৃন্দ বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন ব্যস্ত ব্যগ্র উদ্বিগ্ন ভাবে লজপৎ আসিয়া খবর দিলেন "সরে পড়, সরে পড়, তোমরা গ্রেপ্তার হবে।" তিলক হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো চাই, ভয় কি?" লজপৎ সবে তখন দেশান্তরী দশা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁর বেশ একটু ভীত অবস্থা। প্রথম দিন পথে পথে সত্যেন্দ্র একদল ছেলে লইয়া রাজভক্তিসূচক উক্তিওয়ালা মঞ্চে সন্তর্পণে আগুন ধরাইয়া ফিরিতেছিল। হঠাৎ লজপতের গাড়ি দেখিয়া সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া ওঠে; তাহাতে গাড়ি থামাইয়া লজপৎ রক্তচক্ষে বলেন, "চোপ রও।" প্রথম দিন কংগ্রেস-মণ্ডপে লপজৎ একরকম লুকাইয়াই গা ঢাকা দিয়া ঢুকিতেছিলেন, ভীম রবে বন্দেমাতরম্ জয়ধ্বনি উঠিল। সর্দ্দার অজিত সিং সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্য বদনে নত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিলেন কিন্তু লজপৎ লুকাইয়া পিছনে বসিলেন। সেও একদিন গিয়াছে, যখন লজপৎ সাবধানী, গান্ধীজী মডারেট! শেষে ভারতের

পিলে চমকাইয়া বোমা কয়টা ফাটিতেই কেহ গেলেন আমেরিকা কেহ গেলেন বিলাত। ভারতে তখনকার রাজনীতিক ব্যবসার দাম কাঁচা মাথা, সে মূল্য দিবার মানুষ তখন এদেশে মাত্র দু' চারশ'ই গজাইয়াছে। তার বেশী বড় একটা ছিল না। তাহাদের মধ্যে কথা ছিল "শিরদার, তব্ সরদার"—যে মাথা দেয়, সেই নেতা।

সেবার কংগ্রেস বসিতে না বসিতে শিঙা ফুঁকিল, আমাদের গুপ্ত-চক্রেরও প্রায় সেই দশা। তৃতীয় দিনে একদিকে ন্যাশনালিষ্ট কন্‌ভোকেশন চলিতেছে ও অপর দিকে মডারেট কংগ্রেস চলিতেছে। মডারেট কংগ্রেসের দ্বারে ছাড় পত্র লইয়া ও অঙ্গীকার পত্র সহি করিয়া ঢুকিতে হয়, মডারেটের যত ফিকে ঢিমে তেতালা ব্যবস্থা সেই অঙ্গীকার পত্রে পত্রস্থ করা হইয়াছে। ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে বসিয়া তিলক মত দিয়াছিলেন যে, গরমদল যখন দলে ভারী আছে তখন ঐ অঙ্গীকার পত্র সহি করিয়াই ঢুকিয়া পড়া যাক, গরমদলের বানে সব ভাসাইয়া দাও—let us swamp the Congress! অরবিন্দ কিন্তু তাহাতে রাজী হন নাই, তিনি বলিলেন, "যাহা একবার খাঁটি বলিয়া, সত্য বলিয়া ধরিয়াছি, সে মত, সে principle কি করিয়া বদলাইব?" তিলকের দক্ষিণ হস্ত খাপার্দ্দেও অরবিন্দের দিকে বাঁকিয়া বসিলেন, অগত্যা সে যাত্রা গরমদল পৃথক কন্‌ভোকেশনে মিলিত হইয়া ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

ইত্যবসরে আমি অনুরোধ উপরোধ করিয়া কয়েকজন মারাঠী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বাঙালী বিপ্লবপন্থী নেতাকে একটি গুপ্তচক্রে আহ্বান করিলাম। কে বিপ্লবপন্থী, কে নয়, আমি সে বিষয়ে আনাড়ী ছিলাম, দুই চার জনকেই মাত্র চিনিতাম। কাজেই তিলককেও ডাকিয়াছিলাম, তিনি কিন্তু এ দলের নন বলিয়া আসিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বুড়া হইয়াছি, আমি জীবনে চিরদিন আমার কর্ম্মের বাঁধা সড়কেই চলি, তোমরা তরুণেরা যাহা পার কর।" তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, দুই চারটা পাগল জুটিয়া দুঃস্বপ্ন দেখি-

বৈঠকী নেতা—arm chair leader, আমাকে পাইয়া পাকে প্রকারে তাঁহাদের কেবল এইটুকু জানিবার ইচ্ছা যে, আমরা বাঙলায় কতদূর কি করিয়াছি। ব্যাপার দেখিয়া পেশোয়া বুদ্ধির ক্ষুরে হাজার দণ্ডবৎ করিলাম আর সেই বুড়া ডাক্তারকে একচোট চাটিম চাটিম বুলি ঝাড়িয়া গায়ের ঝাল মিটাইলাম। বলিলাম, "আজ ফাঁকা আওয়াজের কর্ত্তামী করছেন আপনারা, তা করুন; মোদ্দা শীঘ্রই সেদিন আসছে যখন তরুণ কাজের কাজীরা আপনাদের রম্ভা প্রদর্শন করে, নাকচ করে, কাজে নামবে। আজ আপনারা সুরেন্দ্রনাথের যে হাল করলেন, কাল আপনাদের অদৃষ্টেও তাই আছে।"

সেই মুসলমান পাঞ্জাবী নেতাটি আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বেশ বেশ, বাবুজী; আপনারা একটা শুধু অশান্তি—state of unrest দেশময় আনুন, তারপর কাবুলের আমীর সাহেব প্রস্তুত আছেন, আমরা পাঞ্জাবী মুসলমানরা দরজা খুলে দেবো।" আমি মনে মনে বলিলাম, "ওরে মিটমিটে ডাইন, তোমার পেটে পেটে এই ছিল।" প্রকাশ্যে বলিলাম, "কি খাঁ সাহেব, ভারতে তা' হ'লে আমীরই বাদশাহী করবেন? আমাদের রিপাবলিকটা কি তবে কাবুলী ষাঁড়ের ডালনা চাপা পড়ে থাকবে নাকি?" তখন

আমার মনের আশার গোলাপী আভা বিপদের অতি বড় তিমিরেও মুছিতে পারে না। তাই এমন রিক্ত অসহায় বলিয়াই আজ দ্বিগুণ উৎসাহ ও বজ্রাগ্নি বুকে ধরিয়া দেশে ফিরিলাম। কেউ নাই, সব কাজ অসমাপ্ত, তবেই তো চতুর্গুণ প্রয়াস করা দরকার; বসিয়া পড়িবার আর সময় কই?

বহুদিন পূর্ব্বে যখন গুরু অন্বেষণে গুজরাটের অভিমুখে যাইতেছিলাম তখন কোন খ্যাতনামা মহারাষ্ট্র নেতার বাড়ীতে একদিন আতিথ্য গ্রহণ করি। ইনি সেই জেলার বিপ্লব-পন্থীদের নেতাও বটেন, আবার গরম দলের চাঁইও বটেন, গাছও নাড়া দেন এবং তলারও কুড়ান। আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে বসিয়া তিনি অনেক রাজা উজীর মারিলেন, বলিলেন, যে—"এই জেলা আমার মুঠার মধ্যে, এখানে আমি অরাজকতার দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইতে পারি।" পুল, রেল উড়াইবার প্রস্তাবে বলিলেন, "সে আর কঠিন কি? করিলেই হইল। এক রকম মার্চ্চ বা কুচকাওয়াজ প্রণালী আছে যাহার ধ্বনির ছন্দে (rythm) পুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" তাহার পর যখন কালবৈশাখী ঘনাইয়া আসিল তখন ইনি এক লম্ফে সাগর পার। তখন বচনবাগীশের ছিল মোড়লীর দিন, কে

তেছে। সর্দ্দার অজিত সিংও আসিলেন না; শুনিলাম পঞ্জাবের যে একজন মুসলমান নেতাকে অমি ভ্রমক্রমে ডাকিয়াছি, তিনি নাকি গোয়েন্দা। তিনি তাঁহার গরমদলের নেতাগিরির নলচে আড়াল দিয়া গভর্ণমেণ্টকে খবরাখবর দিয়া থাকেন, লালা লজপৎ রায় ও অজিত সিংএর দেশান্তরী হইবার (deportation) তিনিই নাকি মূল।

গুটিকয়েক বাঙালী, গুটিকয়েক মারাঠী ও সেই পাঞ্জাবী দু'মুখো সর্পকে লইয়া অগত্যা একটা যা' হোক গতিকের চক্র বসিল। কথায়-বার্ত্তায় বুঝিলাম, মারাঠীরা বাক্যেই কাজ সারেন, ও অতিমাত্র সাবধানী চালে চলিতে গিয়া তাঁহাদের চলাটাই থাকিয়া যায় উহ্য, সাবধানতাটা জুড়িয়া বসে প্রায় সবখানি আসর। অধিকাংশই তাঁরা বৈঠকী নেতা—arm chair leader, আমাকে পাইয়া পাকে প্রকারে তাঁহাদের কেবল এইটুকু জানিবার ইচ্ছা যে, আমরা বাঙলায় কতদূর কি করিয়াছি। ব্যাপার দেখিয়া পেশোয়া বুদ্ধির ক্ষুরে হাজার দণ্ডবৎ করিলাম আর সেই বুড়া ডাক্তারকে একচোট চাটিম চাটিম বুলি ঝাড়িয়া গায়ের ঝাল মিটাইলাম। বলিলাম, "আজ ফাঁকা আওয়াজের কর্ত্তামী করছেন আপনারা, তা করুন; মোদ্দা শীঘ্রই সেদিন আসছে যখন তরুণ কাজের কাজীরা আপনাদের রম্ভা প্রদর্শন করে, নাকচ করে, কাজে নামবে। আজ আপনারা সুরেন্দ্রনাথের যে হাল করলেন, কাল আপনাদের অদৃষ্টেও তাই আছে।"

সেই মুসলমান পাঞ্জাবী নেতাটি আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বেশ বেশ, বাবুজী; আপনারা একটা শুধু অশান্তি—state of unrest দেশময় আনুন, তারপর কাবুলের আমীর সাহেব প্রস্তুত আছেন, আমরা পাঞ্জাবী মুসলমানরা দরজা খুলে দেবো।" আমি মনে মনে বলিলাম, "ওরে মিটমিটে ডাইন, তোমার পেটে পেটে এই ছিল।" প্রকাশ্যে বলিলাম, "কি খাঁ সাহেব, ভারতে তা' হ'লে আমীরই বাদশাহী করবেন? আমাদের রিপাবলিকটা কি তবে কাবুলী যাঁড়ের ডালনা চাপা পড়ে থাকবে নাকি?" তখন

তিনি বেগতিক বুঝিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "ওহেহে, না না, তা কেন তা কেন? তিনি শুধু সাহায্য করতে আসবেন। আপনারা একটা অরাজকতা আগে আনুন না?"

অগত্যা ভারতব্যাপী বিপ্লবের স্বপ্ন মনে মনে ধামা-চাপা দিয়া সে রাত্রের মত উঠিয়া পড়িলাম, মনে মনে বলিলাম, "কুছ পরোয়া নেই, ও মন, একলা চলো রে।" এত দিন জানিতাম মহারাষ্ট্র আশাসোটা ধরিয়া প্রস্তুত। শিবাজীর সেই মাওলী সেনা, ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গির পাল, দশ গুরুর বান্দারা সব পিছনে আছে। আজ বোধ হইল সব ফাঁকা, শূন্য মরু বিস্তারে অসহায় সর্ব্বত্যাগী শুধু আমরা মুষ্টিমেয় কয়জন। কিন্তু আমার স্বভাব সর্ব্বদাই বেহিসাবী দুঃসাহসী গোছের, আমার মনের আশার গোলাপী আভা বিপদের অতি বড় তিমিরেও মুছিতে পারে না। তাই এমন রিক্ত অসহায় বলিয়াই আজ দ্বিগুণ উৎসাহ ও বজ্রাগ্নি বুকে ধরিয়া দেশে ফিরিলাম। কেউ নাই, সব কাজ অসমাপ্ত, তবেই তো চতুর্গুণ প্রয়াস করা দরকার; বসিয়া পড়িবার আর সময় কই?

বহুদিন পূর্ব্বে যখন গুরু অন্বেষণে গুজরাটের অভিমুখে যাইতেছিলাম তখন কোন খ্যাতনামা মহারাষ্ট্র নেতার বাড়ীতে একদিন আতিথ্য গ্রহণ করি। ইনি সেই জেলার বিপ্লব-পন্থীদের নেতাও বটেন, আবার গরম দলের চাঁইও বটেন, গাছও নাড়া দেন এবং তলারও কুড়ান। আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে বসিয়া তিনি অনেক রাজা উজীর মারিলেন, বলিলেন, যে—"এই জেলা আমার মুঠার মধ্যে, এখানে আমি অরাজকতার দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইতে পারি।" পুল, রেল উড়াইবার প্রস্তাবে বলিলেন, "সে আর কঠিন কি? করিলেই হইল। এক রকম মার্চ্চ বা কুচকাওয়াজ প্রণালী আছে যাহার ধ্বনির ছন্দে (rythm) পুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" তাহার পর যখন কালবৈশাখী ঘনাইয়া আসিল তখন ইনি এক লম্ফে সাগর পার। তখন বচনবাগীশের ছিল মোড়লীর দিন, কে

কাজের মানুষ আর কে জিহ্বা-বীর তাহার নিরীখ তখনও হয় নাই বলিয়া নেতাগিরি ছিল বড় সহজ কাজ। লম্বা লম্বা দুঃসাহসিক প্রস্তাব জলের মত করিয়া গেলে, মানুষ থ হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত আর মেষের মত অনুসরণ করিত। আমরাও অনেক স্থলে বচনেই কাজ সারিতাম, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম আমরা সংখ্যায় বেশি নই, পঞ্চাশ হাজার, কত খরচ হয় জানিতে চাইলে হাঁকিতাম দু' দশ লাখ। তবে পার্থক্যের মধ্যে আমাদের বাঙলার পিছনে তবু একটা দল ছিল, বোমা বারুদ পিস্তল বন্দুক ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রে প্রায় সবটাই ছিল অশ্বডিম্ব। ইহারা তখনও সেই প্রথম বিপ্লব-নেতা ঠাকুর সাহেবের নাম ভাঙাইয়া দিন-গুজরান্ করিতেছিলেন, প্রথম মূল সমিতি তখন মরিয়া পঞ্চত্ব পাইয়া গিয়াছিল।

৭

অরবিন্দের সাধন লাভ

কংগ্রেস ভাঙিল কাহার দোষে? এ কলহে কোন্‌টি ধর্ম্ম পক্ষ আর কোন্‌টি অধর্ম্ম পক্ষ তাহা লইয়া দেশময় সোরগোল পড়িয়া গেল। গরম দলের নেতারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং স্থানে স্থানে সভা সমিতিতে আপনাদের পক্ষের কথা দেশের লোককে বিশদ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। সুরাট হইতে অরবিন্দ আসিলেন গায়কোবাড়ের রাজধানী বরোদায়। সুরাটে কংগ্রেসেই সাখরিয়া স্বামীও আমাদের সহিত আসিয়া জুটিয়াছিলেন, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে একটা কুকুরে বিষম দংশন করিয়াছিল, কিন্তু বেপরোয়া সাধু তাহার কোন ঔষধ পথ্য বা প্রতিকারই করেন নাই।

বরোদার পথে তিনিও আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে জুটিলেন। অরবিন্দ আসিতেছেন শুনিয়া বরোদা কলেজের প্রিন্সিপাল আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কোন ছাত্র যেন তাঁর অভ্যর্থনায় না যায়। ষ্টেসন হইতে কলেজ-গেটের পাশ দিয়াই পথ। আমাদের গাড়ী ঐ অবধি আসিবামাত্র সমস্ত কলেজ ভাঙিয়া ছাত্র বাহির হইয়া আসিল ও ঘোড়া খুলিয়া বন্দে মাতরম্ রবে গাড়ী টানিতে লাগিয়া গেল। কলেজে শূন্য ক্লাসে প্রফেসাররা একা বসিয়া কড়িকাঠ গুণিতে গুণিতে প্রহর অতীত করিলেন।

বরোদা যাত্রার পূর্ব্বেই আমি লেলেকে তার করি যে, অরবিন্দ তাঁর দর্শনাভিলাষী। বেলা ৮৷৯টায় লেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাতে ও অরবিন্দে একান্তে আধঘণ্টা আলাপ হইল, আমরা তখন

স্থার সুবা খাসিরাও যাদবের বাড়ীতে। লেলের সহিত সেই প্রথম আলাপের পর বরোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন, একবার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহার পর আর কেহ অরবিন্দকে পায় নাই। তখন দেশময় তাঁহাকে চায়। বরোদায় কত মানুষ তাঁহাকে দেখিতে উন্মুখ। লেলে কিন্তু বলিলেন, "আমার সাধনা তোমায় দেব, কিন্তু একান্তে সাত দিন আমার সঙ্গে থাক।" অরবিন্দ বলিলেন, "কোথায় ?"

লেলে। আমি গোপন স্থানের ব্যবস্থা করবো।

তাহাই হইল। হঠাৎ অরবিন্দ উধাও হইলেন। চারিদিকে পাগলের মত শহর সমেত মানুষ যাঁহাকে খুঁজিতেছে, তিনি কোথাও নাই! যেখানে লেলের নির্দ্দেশে আমরা গেলাম সে এক বিরাট জনহীন পুরী। সেখানে লেলের স্ত্রী রাঁধেন, অরবিন্দ, লেলে ও আমি খাই। তাঁহারা দুজনেই দিবারাত্র মুখোমুখী ধ্যানে কাটান। আমায়ও লেলে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আমি মাঝে মাঝে বসি বটে কিন্তু মাথায় তখন বিপ্লবের পোকা গজ গজ করিতেছে; তাহারা আমায় স্থির হইয়া বসিতে দিবে কেন? কাজেই কোন গতিকে ফাঁক পাইলেই আমি সরিয়া পড়ি এবং একটি তালা ঢালাইয়ের কারখানায় বসিয়া ঢালাইয়ের কাজ দেখি ও শিখি। বোমার বারুদের জন্য পিতলের বা কাঁসার আধার ঢালাই করিতে হইবে, কোথায় তাহা শিখিব তখন আমার কেবল সেই চেষ্টা। ভগবানকে ঠিক তখনই সদ্য সদ্য না পাইলেও আমার চলে, তবে তিনি যদি বোমার কারখানার মিস্ত্রী বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভরা লোহার সিন্দুক হইয়া আসিতেন তাহাতে আমার বড় আপত্তি ছিল না। তখন আমার সাধনা খুলিয়াছে বটে, কিন্তু মনে বড় অশুদ্ধি, কত প্রবৃত্তির ঢেউ, কত চিন্তা, কত সংকল্পের মাতাল হাওয়া। এই সব দানাদৈত্যের জ্বালায় ধ্যান করা প্রায় অসম্ভব। বিঘ্নের কথা শুনিয়া লেলে বলিলেন, "তোমার মনে প্রাণে অশুদ্ধি রয়েছে, কাম রয়েছে, তাই এ বিঘ্ন।" আমি রাগিয়া গেলাম,

বলিলাম, "আমি তো দেশের কাজে উৎসর্গিত-প্রাণ, কাম আবার কোথায় দেখলেন।"

লে। (সহাস্যে) আছে বই কি, তুমি বুঝতে পার না। আমার কাছে শক্তি নাও, আধার শুদ্ধ হবে। কিছু দিন শুধু ঘি আর রুটি খাও, লবণ পর্য্যন্ত নয়। সকালে কেবল ফল মূল খাবে।

দুই এক দিন দুইবেলা তাহাই করিয়া লোভের জ্বালায় শেষটা যাই আর কি। অগত্যা সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া খাসিরাওএর বাড়ী গিয়া মাংস ডিম খাইয়া তবে এ পৈতৃক লক্ষ টাকার প্রাণটা কোন গতিকে রক্ষা করি। মিষ্ট নয়, লবণ নয়, মাছ নয়, মাংস নয়, কেবল ঘি আর শুকনো রুটি! বাপ্!! আমার এমন নীরস নিরম্বু ভগবান পাইয়া কাজ নাই, আপাততঃ দেশের কাজ ও যথারীতি অবাধ ভোজন চলুক, তাহার পর কৃচ্ছ্রসাধনায় ভগবান লাভ পরে পশ্চাতে দুঃখের দিনে দেখা যাইবে। ভারতে দুর্ভিক্ষের মড়ক তো লাগিয়াই আছে, না খাইতে পাইয়া ভবিষ্যতে চিঁচিঁ করা কিছুমাত্রই আশ্চর্য্য নয়। আর ভারত যদি বোমার ঘায়ে উদ্ধারই হইল তাহা হইলে সে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বাধীন ভারতের ভগবান নিশ্চয়ই ভোগবিরোধী অনাহারী ভগবান হইবেন না। তখন চাই কি আবার বাঙলার তন্ত্র বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া লক্ষ ক্ষিপ্ত-বাসনাতাড়িত আমি ফাঁকি দিয়াই একরকম সে কয়দিন কাটাইলাম।

অরবিন্দ স্বভাবযোগী ও ধীরপ্রকৃতি, বরোদায় সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি পুস্তকের রাশির মধ্যে ডুবিয়া যে অসাধ্য জ্ঞানের তপস্যা তাঁহাকে করিতে দেখিয়াছি, তাহাতেই বেশ স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি কোন্ অসাধারণ ধাতুর তৈয়ারী। কয়েক দিনের অনন্যমন সাধনায় লেলের সমস্ত যোগবল অরবিন্দে সঞ্চারিত হইয়া গেল, মাত্র তিন দিনে তিনি অচল নীরব ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলেন। বরোদা হইতে বোম্বাইয়ে আসিলে এই অপূর্ব্ব সাধনা আরও ফুটিল, স্বতঃস্ফূর্ত্ত মন্ত্র আপনি উঠিতে লাগিল।

পুণায় বক্তৃতাকালে অরবিন্দ লেলের উপদেশে আগে কর্ত্তব্য বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বক্তৃতা দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্ত হইয়া শূন্য মন নিয়া বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইবামাত্র, আপনি অনর্গল কথার পর কথা কে যেন অন্তরে বসিয়া যোগাইয়া দিত। তাহার পর তাঁহার কলিকাতা যাত্রা; যাইবার পূর্ব্বে তিনি লেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন তো আমি আপনাকে সঙ্গে পাব না, কিরূপ কি প্রণালীতে সাধনায় চলতে হবে আমায় বলে দিন।" লেলে প্রথমে সাধনার নানা উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে যে বাণী এসেছে, তাতে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করে চলতে পারবে?"

অর। হ্যাঁ, তা সহজেই পারবো।

লে। তবে তাই করো তা' হ'লে আর কোন উপদেশই দরকার হ'বে না। ঐ বাণীই তোমায় সব বুঝাবে ও করাবে।

তাহার পর আমার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন ও অরবিন্দের পুণার দিকে যাত্রা। তাঁর পথ মুক্ত, সহজ রাজনীতি; আমার পথ গুপ্ত, কুটিল বিদ্রোহ, কাজেই কত দিন আর এক সঙ্গে চলে? অত বড় স্বদেশী বয়কটী যুগ গিয়াছে, তাহাতে তাঁর সঙ্গে যে আমার মাত্র ক'দিন দেখা হইয়াছে ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ জ্ঞানতঃই হউক বা অজ্ঞানতঃই হউক, আমার কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কালের তিনিই নেতা বল, আদর্শ বল, গুরু বল—সবই। যদি আমার আয়ুতে ও শক্তিতে কুলায়, আর যদি ভগবানের ইচ্ছা তাহাই হয়, তাহা হইলে সাধ রহিল, অরবিন্দের জীবনী লিখিতে গিয়া তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধের সকল কথাই মনের মত গুছাইয়া আর একবার বলিব।

ফিরিয়া আসিলাম মুরারীপুকুর বাগানে—আমাদের বিপ্লবের আড্ডায়। আমাদের মধ্যে সবাই শুনিল, এবার আর মহারাষ্ট্র পিছনে নাই, সমস্ত দেশ জাগাইবার জন্য বাঙলাকে—বাঙলার মুষ্টিমেয়

মৃত্যুভয়হীন বালককে একা পথ চলিতে হইবে। আমার মন এইবার হইতে সকল দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, বিচার ত্যাগ করিল; পরের মুখ চাওয়ার দুর্ব্বলতা ছাড়িয়া, এই নূতন মুক্তির বলে মন যেন বলিয়া উঠিল, "আমি সব পারি, যাহা কেহ পারে না আমি তাহাও সাধিয়া দেখাইব।" চিরদিন বিপদে আশ্রয়হীন দশায়, অভাবেই আমার এইরূপ অসীম সাহস জাগে, আজও জাগিল। এই সময়ের কথা বলিতে গিয়া উপেন তার নির্ব্বাসিতের আত্মকথায় বলিয়াছে, "চারিদিক হইতে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সাড়া পড়িয়া গেল, ক্রমাগতই নূতন নূতন ছেলে আসিয়া জুটিতে লাগিল।" ছেলে জোটান আর শক্ত কি? তখন চারিদিকেই অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, সুহৃদ সমিতি কাজ করিয়াছে, একটা কিছু খুন খারাবী করিতে হইবে, এ ভাব বাঙলার সকল জাগা তরুণ প্রাণগুলিতে জাগিয়াছে। আমাদের জেলায় জেলায় ছোট ছোট আড্ডাগুলিতে চিঠিবাজী করিবামাত্রই ছেলের দল হু হু করিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু টাকা কোথায়? এ কাজ তো চাঁদার টাকায় হয় না। টাকাও কিন্তু এই কয় মাসে যত পাইয়াছি, এত আর কখনও নয়, সে সব কথা এই কাহিনীর প্রথম খণ্ড বোমার কথারই মাল মসলা, এখানে তা' অপ্রাসঙ্গিক।

টাকা কিছু জুটিলেও কিন্তু অভাবের তুলনায় তাহা মরুর মাঝে জলের ছিটা। অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া, দেশের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে গুণ টানিয়া টানিয়া, প্রাণ মন যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন লেলের দেওয়া সাধনাটুকু লইয়া ধ্যানে বসিতাম। কিন্তু আমার তো সত্য সত্য তখনও ভগবান পাওয়ার দরকার ছিল না, ভগবান কি বস্তু, মানুষের জীবনই বা সে পরশ রতন স্পর্শে কিরূপে রূপান্তর হয়, শক্তিতে জ্ঞানে ভগবৎ সত্ত্বায় পূর্ণ হয়, তাহা তখন বুঝিতাম না। আমার ভাবনা, চিন্তা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জপ, তপ, সব ছিল দেশ! ভাবিতাম এই দেশই তো ভগবানের বিগ্রহ, এর পূজাই পরা-পূজা। কিন্তু কাহার বিগ্রহ, কই সে ভগবান, যিনি এই আসিন্ধুহিমাচল বিগ্রহে রূপ লইয়া

আমার পূজা গ্রহণ করিবেন সে বিচার করিতাম না। ভগবৎ বস্তু চাহিতাম, কিন্তু জানিতাম না, পাইতে সাধ যাইত, কিন্তু খুঁজিতাম না, দেশ উদ্ধারই ছিল সাধ্য, ভগবান ছিল উপায়। তবু ধ্যান করিতাম কি জানি কিসের টানে, যে ইঙ্গিত পাইতাম তাহা এত অসহ্য যে আমায় সাধন ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়িতে হইত। এ যে আমারই চিত্ত ও প্রাণের অশুদ্ধির জ্বালা, এমন অযাচিতে পাওয়া অমৃতও যে আমারই বিষের ভাণ্ডে বিষাক্ত হইতেছে, তাহা বুঝিতাম না। তাই লেলেকে পত্র লিখিলাম, "ধ্যানে বসতে গেলেই এই জ্বালা। তুমি কি অপূর্ব্ব রসের উৎস খুলে দিলে, কি উপায়ে তা আমার তৃষিত জীবনে গ্রহণ করবো তা জানি নে। তুমি একবার বাঙলায় এসো, আমি পাথেয় দেব।"

৮

বাঙলায় লেলে

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেলে, বাঙলায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি আমার সেজদা অরবিন্দের স্কট্ লেনের বাসায় ছিলেন। তখন বাবা-ভারতী, সবে মাত্র একদল মেম বৈষ্ণবী লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া লেলে বলেন, "এ মানুষ খুব সাধক", ভক্তি ও প্রেম-ধর্ম্ম যাঁহার সাধ্য বস্তু, তাঁহার কাছে ভক্তের আসনই সবার উচ্চে। লেলে প্রেমভক্তির পথেই সাধনা করিতেন। বাগানে উপেনের সহিত তাঁহার আলাপে, উপেন বেদান্ত প্রতিপাদ্য জ্ঞান-পন্থার কথা বলিত, আর ব্রহ্মবস্তুই চরম বস্তু বলিয়া তর্ক করিত। লেলে বলিতেন, "দেখো, অরূপ সত্য, কিন্তু রূপও সত্য; আমি দেখেছি।" বেদান্ত-জ্ঞান ও সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্মের কথা শুনিয়া বলিতেন, "তা' কি অনুভব করেছ, পেয়েছ? তা হলে আমার কিছু বলবার নেই, তা হ'লে তো তোমার হয়ে গেছে।" যে পরম ধন অন্তরে ধরিয়া সহজ হইয়াছে তাহার সহিত তর্ক চলিবে কেন? প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাষাই আলাদা। বেলুড় মঠে একদিন লেলে গিয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত ঘরে দুয়ার দিয়া সাধনায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও লেলের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার সহিত তাঁহার একটি মারাঠি শিষ্যও বঙ্গদেশে আসেন।

তখন বাগানের কাজ জোর কদমে চলিয়াছে, বৈদ্যনাথ জংসনের আড্ডাও দুই একমাস হইল আরম্ভ হইয়াছে। লেলেকে বাগানে আনিয়াছিলাম, তাঁহাকে ভিতরের খবর কিছুই দিই নাই বটে, কিন্তু

তিনি সবই টের পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এরা না-জানি-কি-একটা দানবে কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে, পরিণাম বিচার না করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র অহমিকার শক্তিতে অন্ধ-বিশ্বাসী এরা দৃঢ় ত্বরিৎ পদে চলিয়াছে, একটা সর্ব্বনাশা লক্ষ্যে—নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে। ভগবদ্-জ্ঞানীর কথা সকলেই শুনিয়াছে, সে যে কি অপূর্ব্ব মানুষ, কোন্ অচিন সত্যে তাহার বাসা, তাহা প্রত্যক্ষতঃ জানে কয় জন? যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকম্ ততঃ, যাহাকে পাইয়া আর কোন ঐশ্বর্য্যই অধিক বলিয়া মনে হয় না, সেই আপ্তজনের পরশমণি পাইয়া লেলের কর্ম্মের মোহ ছিল না। সে কাজ করিত, কাজের লালসায় নয়, অন্তর দেবতার ইঙ্গিতে—তাঁহার বাণী শুনিয়া। লেলে আমায় তাহাই দিতে চাহিলেন, একদিন অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখো, তোমরা এ পথ কিসের জোরে ধরেছ? ভারত স্বাধীন একদিন হবেই, তা' অনিবার্য্য; কাল প্রাতে উদয়াচলের কোলে সোনার থালা সূর্য্য উঠবে, এ যেমন অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী, ভারতের ভাবী স্বাধীনতাও তাই। কিন্তু এ পথে নয়।"

আ। তবে কোন পথে?

লে। দেশকে—মানুষকে মুক্ত করতে হলেই কি তা রক্তারক্তি ছাড়া হয় না? ভারত বিনা রক্তপাতেই মুক্ত হবে।

আমি। কি করে?

লে। কি করে, তাই যদি দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো। একটা নির্জ্জন পার্ব্বত্য গুহায় আমি তোমায় বসিয়ে দেব, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এমন করে দেবো, তুমি সেইখানে বসেই সব পাবে। ছয় মাস সেখানে সাধনা কর; আমি বলছি, ভগবানের আদেশ পাবে। যারা দেশের নেতা হতে যাচ্ছে, এত কোটি মানুষের ভাগ্য হাতের মুঠোয় নিতে যাচ্ছে, তাদের অন্ধ হয়ে কাজ করলে ত চলবে না। দেখে পথ চলো, ভগবানের আদেশ নিয়ে পথ চলো, তাহলে ভুল আর হবে না, যাঁর কাজ তিনি শক্তি দেবেন, পথ দেখাবেন।

আমি। তা কি করে হয়? আমি কত মানুষের কাছে হাজার হাজার টাকা নিয়েছি, গীতা ও অসি ছুঁয়ে শপথ করেছি, যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ততদিন আমার এই ব্রত। আমি ছয় মাসের জন্যে কি করে কাজ ছাড়তে পারি?

লে। কাজ আমি ছাড়তে বলছি নে, আদেশ পেয়ে তুমি যা ইচ্ছা কোরো, তখন আমি কোন আপত্তি করবো না।

আমি। তা' হয় না।

লে। আচ্ছা, তিন মাসের জন্যে এসো, আমি কথা দিচ্ছি, তিন মাসের মধ্যেই ভগবানের বাণী শুনতে পাবে।

আমি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তিন মাসের জন্যেও কাজ ছাড়তে পারি নে।

লে। শীঘ্রই তোমাদের সামনে ভীষণ বিপদ আসছে।

আমি। কি? মৃত্যু? না হয় ধরে ঝুলিয়ে দেবে, তার জন্যে তো প্রস্তুত হয়েই এ কাজ করতে নামা।

লে। সে বিপদ মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।

আমি শুনিলাম না। লেলে আমায় বুঝাইলেন, উপেনকে বুঝাইলেন, কেহই অকপট বিশ্বাসে তাঁহার কথা লইলাম না। উপেনের স্বভাব সন্দেহে দোলা, কেবলি এটা করি কি ওটা করি এমনি ইতস্ততঃ করা; আমার স্বভাব অল্প চিন্তায় যা' হয় একটা সিদ্ধান্ত করা, quick decision and quick action. লেলের কথায় প্রায় ভিজিয়া উপেন সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল।

একদিন স্কট্ লেনস্থ সেজদা'র বাড়ীতে লেলেকে খুঁজিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ একটা দুয়ার ঠেলিয়া দেখি তিনি চক্ষু মুদিয়া মৃতের মত পড়িয়া আছেন আর তাঁহার একজন মারাঠী শিষ্য তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তখন অন্তর্জগতের ব্যাপার কিই বা বুঝি, তবু একটা ভয়ে শ্রদ্ধায় সসম্ভ্রমে দুয়ার নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলাম। আজ ইহার অর্থ বুঝি, এই অপূর্ব্ব

সাধক তাঁহার আত্মসমর্পিত ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আপন সাধন বল এই তরুণ হৃদয়ে সঞ্চার করিতেছিলেন ; আজ বুঝি তাঁহার নিজে গুরু হইবার লালসা বলিয়া যাহা মনে করিতাম, তাহা পিপাসুর অন্তর দুয়ার খুলিবারই কৌশল। অতবড় অকপট নিঃস্বার্থ সর্ব্বত্যাগীর এই আচরণ তখন যেন কেমন খাপছাড়া মনে হইত, কিছুতেই একটা সামঞ্জস্যে ধরা দিত না। আমার মত হিন্দুর ছেলে, তপোভূমি ভারতের সন্তান—প্রতীচ্যের মানুষের এ সন্দেহ, এ বিড়ম্বনা কেন? ঐটুকু পাশ্চাত্যের সভ্যতার রঙ, য়ুরোপ তাহার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বস্তুতন্ত্রের জ্ঞান ও অহঙ্কার আনিয়া আমাদের জাতিগত সহজ শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, অমৃতের পুত্রের অন্তরে সেই অনন্ত-লোকের সদা-অর্দ্ধোন্মুক্ত দুয়ারটি আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

লেলে যাইবার সময়ে আমাকে ও উপেনকে না পাইয়া প্রফুল্ল চাকীকে লইয়া চলিলেন। আমি আপত্তি করি নাই, কিন্তু উপেন তাহাকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া আধপথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। তখন মরণ তাহার শিয়রে, চাকীর মনের এতদিনকার ঐকান্তিক কামনা সকলের হৃদ্‌বিহারী দেবতা তখন শুনিয়াছেন, তাহার সাধু হইতে যাওয়া ঘটিবে কেন? অগত্যা লেলে একাই ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পরই আমাদের সকল সাধে জলাঞ্জলি ও গ্রেপ্তার। মহাপুরুষের বাক্য সফল হইল, আমরা মৃত্যুকল্প বিপদ মাথায় করিয়া জেলে ঢুকিলাম। লেলে যে অসাধারণ শক্তিমান সাধক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একদিন সেজদার বাড়ীতে বসিয়া উপেনের অতি গুহ্য কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, উপেনকে একদিন কাছে বসাইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তির এক আনন্দের স্তরে অল্পক্ষণের জন্য তুলিয়া দিয়াছিলেন। এত দেখিয়াও আমাদের পাপ মন কিন্তু বুঝিল না ; তখনও এ কয়টা ভাঙা কুলায় করিয়া বিধাতার ছাই ফেলা সাঙ্গ হয় নাই, তখনও অনেক ঘাটের জল খাইয়া অনেক ঘোরা ঘুরিতে হইবে যে!

কলিকাতায় আসিয়া লেলে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এখন তুমি কি কি সাধনা কর ?"

অর। কিছুই করি নে।

লে। সে কি ?

অর। সব ছেড়ে দিয়েছি। যিনি আমার মাঝে মন্ত্র তুলেছিলেন তাঁর ওপর নির্ভর করার পর বাণী এসেছে। এই বাণীই এখন আমার পথপ্রদর্শক, তারই ইঙ্গিতে আমি সকল সাধনা ছেড়ে দিয়েছি।

লে। ওহ! তোমায় শয়তান পথ ভোলাচ্ছে—Oh! The devil has got hold of you.

অরবিন্দের তখন গভীর সাধনার অবস্থা। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণম্ ব্রজ—সেই সর্ব্ব সমর্পণের পথে জীবন ও অহঙ্কারের সাধনা ভগবচ্চরণে নিবেদিত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত ও প্রেমের সাধক লেলে তাহা বুঝিতে ভুল করিলেন, অরবিন্দও তাঁহার কাছে অতঃপর ভাব গোপন করিতে লাগিলেন।

৯

বাগান ঘেরাও

আমাদের অনেকেরই তখন মরণ পাইয়াছে। এক একটা জায়গায় বোমা ফেলিবার ফরমায়েস আসে আর কে মরিবে, কে এই দুঃসাহসের কাজের আনন্দ মাথায় করিয়া নিজের জীবন লইয়া পাশা খেলিবে তাহার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। যে যাইতে পায় না, সে মুখ ভার করিয়া বসে। প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী একটা কাজে যাইতে পায় নাই বলিয়া, আমার উপর অভিমান করিয়াছিল, তাহার অভিমানও রণচণ্ডী রাখিলেন, মায়ের বরে সন্তান মরিয়া বাঁচিল। সেকাজে মরিবার কথাই নহে, তবু আমাদের সব চেয়ে মনস্বী, ধীর, মহৎ-চরিত্রের ছেলে প্রফুল্লই সে কাজে আচম্বিতে নির্জ্জন পাহাড়ের শৃঙ্গে বোমা ফাটিয়া মরিল। তাই বলিতেছিলাম, বুঝি সেবার মায়ের রণরঙ্গিণী রূপ ঐখানেই সম্বরণ করিবার ইচ্ছা ছিল, নহিলে আমরা সদলবলে এমন করিয়া সব যেন পণ্ড করিব বলিয়া ধরা পড়িলাম কেন? এই প্রফুল্লের কথাই উপেন তার "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা"য় বলিয়াছে, "এই সময় একটা দুর্ঘটনায় আমাদের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমাদের একটি ছেলে অকস্মাৎ মারা পড়ে। যতগুলি আমাদের ছেলে ছিল, তাহার মধ্যে সেইটিই বোধ হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কি ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর সংবাদে * * * একটা অন্ধ রাগ আর ক্ষোভে মনটা ভরিয়া গেল। মনটা শুধু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'সব চুলোয় যাক, সব চুলোয় যাক'।"

বাঙলায় রণচণ্ডীর চামুণ্ডা রূপ আবির্ভাব হইয়াও হইল না, একবার নয়, বার বার সে রক্ত যুগের আগুন বিধির বিধানে মানুষের অনবধানতায় কত কি কারণে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া নিবিয়া গেল। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি বা ভারতের ভাগ্য ও-পথে ফিরিবে না। বুঝি বা মহাপুরুষ লেলের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য্য কিন্তু একরকম বিনা রক্তপাতেই তাহা সাধিত হইবে। আকাশ থেকে ভগবানের আশীর্বাদের ন্যায় এ ধন তোমাদের হাতে আসবে, তোমরা শুধু শাসন-যন্ত্র গড়ে নিলেই চলবে।" ভগবানের মনে কি আছে জানি না, আমি সেই হইতে ও পথ ছড়িয়াছি, তাই কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে বার বৎসর বসিয়া বসিয়া বলিয়াছি, "দেবতা! আজ থেকে আমি তোমার পথের যাত্রী, আপন কাজ আপন অপূর্ব্ব লীলায় তুমি আপনি কর।"

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া আমি দিন গণিতেছিলাম। প্রতিদিন 'এম্পায়ার' কাগজ কিনিয়া দেখিতাম কার্য্যোদ্ধার হইল কিনা। প্রতিদিন বাগান হইতে কেহ যাইয়া বেলা তিনটার সময় এই কাগজ কিনিয়া আনিত; ধরা পড়িবার পূর্ব্বদিন অনিবার্য্য ভবিতব্যের বশে এ ভার পড়ে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর, যাহার হাতে নবশক্তির হাজার কাজের ভিড়। সে বাগানের ছেলে নয়, বাগানের ব্যাপার বড় একটা জানিত না, সবে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নবশক্তির ভার আমাদের হইয়া লইতেছিল। কাজ-কর্ম্ম সারিয়া সে যখন সেদিনকার এম্পায়ার লইয়া বাগানে আসিল তখন রাত্র আটটা। খুলিয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, কাগজ বলিতেছে, "পুলিশ জানে কোথা হইতে কাহাদের দ্বারা এসব কাণ্ড ঘটে। শীঘ্রই ইহার একটা কূলকিনারা হইবে।"

তখনি বাগান ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িবার কথা। কিন্তু সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর হঠাৎ এত মালমসলা সরাই

কোথা? স্থির হইল অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সব যে যার পথে চলিয়া যাইবে, এখন সব জিনিস সামলাও। মালমসলা উপকরণ তখন আমাদের প্রাণ, কারণ অস্ত্র যে এ নিরস্ত্র দেশে দুর্লভ বস্তু। তাড়াতাড়ি বাগানেই মাটির তলায় সবই পোঁতা হইল, তাহার পর অত রাত্রে পরিশ্রান্ত ছেলেরা অনাহারে আর কোথাও গেল না, যে যার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রত্যূষ আর হইতে পাইল না। পুলিশ আসিয়া রাত্র চারটার সময় মুরারীপুকুর বাগান ঘেরাও করিল। আমি হঠাৎ জাগিয়া দেখি বাগানবাড়ীর বাহিরে চারিদিকে খস্ খস্ মচ্ মচ্ শব্দ হইতেছে। উঠিয়া দেখি এক দরজার ফাঁক দিয়া পরেশ মৌলিক উঁকি মারিয়া কি দেখিতেছে আর অন্য দুয়ার দিয়া উপেনও দেখিতেছে। "কি রে কি?" বলিয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদেও কেহ উত্তর দেয় না, আমি পরেশের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিশ। হঠাৎ আমার সেই মরিয়া সাহস কোথা হইতে আসিয়া জুটিল, সামনের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, সামনে দেখিলাম রিভলভার হাতে সার্জেণ্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চাও?"

সা। কে তুমি—Who are you?

আ। আমি বাগানের মালিক, I am the owner of the garden.

সা। বাঁধো ইস্কো।

আ। আয় রে, তোরা সব বেরিয়ে আয়।

কেহ আসিল না, আমায় চার পাঁচ জন পুলিশ ধরিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিল। হুড়মুড় করিয়া কতকগুলি সার্জেণ্ট ও পুলিশ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং একে একে ধরিয়া ধরিয়া ছেলেদের লইয়া পুকুরঘাটে আম-তলায় বসাইতে লাগিল। বাগানবাড়ীতে দুইটা ঘর। পাশে ছোট ঘরে উপেন কখন কি ফাঁকে পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। সে ধৃতের মধ্যে নাই দেখিয়া আমার মনে ধারণা হইল

তবে উপেন যা হোক করিয়া পলাইয়াছে। তাহার পর উর্ষালোকের জন্য সবাই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

সকালে কতকগুলো বাজে রাহিলোক ধরিয়া পুলিশ খানা-তল্লাসির সাক্ষী বানাইল, একজন সার্জেণ্ট আসিয়া আমায় বলিল, "We are going to search your house, search our persons, if you like." "আমরা তোমার এ বাড়ী খানাতল্লাসি করিব, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া দেখিতে পার, সঙ্গে কিছু আছে কি না।" আমার আর তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। মনে ভগবানের উপর একটা অন্ধ অভিমান জমা হইতেছিল, তবু তখনও মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিলাম যে, অস্ত্রশস্ত্র বাহির যদি না করিতে পারে তবে আর আমার কি করিবে। দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

এক ঘণ্টা ঘর তল্লাসী করিয়া এম্পায়ার কাগজখানা, খানকতক চিঠিপত্র ও দু' একটা খালি কার্টিজের খোল ছাড়া আর কিছু বাহির হইল না। দু' একটা সরায় এঁটেল মাটি, রজন ও একটা পৃথক সরায় তিসির তেলের সহিত ঐ দুই পদার্থ মিশান ছিল, তাহা বোমার মসলা ভাবিয়া পুলিশ অতি সন্তর্পণে সঙ্গে লইল। তাহার পর হঠাৎ একজন সাহেব পাশের ঘরে ঢুকিয়া উপেনকে পর্দ্দার পিছন হইতে টানিয়া বাহির করিল, পুলিশের মধ্যে চার পাঁচজন তাহাকে চ্যাং-দোলা করিয়া উলুধ্বনি দিয়া ঘরের বাহির করিল।

এম্পায়ার কাগজখানায় মজঃফরপুরী সংবাদটুকু ব্লু পেন্সিলে দাগ দেওয়া ছিল। সার্জেণ্ট সুম্মুন্দি আমার নাকের কাছে তাহা ধরিয়া বলিল, "a very interesting news, isn't it"—বড় মজার খবর, না?" আমি বলিলাম, "Oh! very! ভারি মজার বৈকি!" উপেনকে বাহির করিবামাত্র সার্জেণ্ট ক্রেজোনি বলিল, "Isn't it funny? কেমন রগড়?" আমি দুই পাটি দন্ত বাহির করিয়া

মনের দুঃখে হাস্য করিলাম। মানুষ যে দুঃখেও হাসে তাহা আমার জীবনে এই প্রথম আরম্ভ হইল।

হঠাৎ আমাকে লইয়া তাহারা সেইখানে উপস্থিত হইল যেখানে জিনিসপত্র পোঁতা ছিল। দেখিলাম মাটি খোঁড়া, আমার এত সাধের গোপন করা বোমা, রিভলভার সবই ঊষার আলোয় ট্যাঙ্কের মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছে। কুলের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূকে রাজপথে দাঁড়াইয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিলে, হিন্দুর সমাজপতি বোধহয় আমার অপেক্ষা বিস্মিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয় না। আমার মন বলিল, "ভায়া! এবার তোমার খেলা ভবের হাটে বুঝি উঠলো।" অভিমানে আমার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, "ঠাকুর! সব ভেঙে দিলে, সব ভেঙ্গে দিলে? তবে নেও, আমিও রিক্ত হয়ে সব দেব।" সেই রাগে যেখানে যাহা ছিল আমি দেখাইয়া দিলাম; বিভূতি ও শচীনকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করিতেছে, ভয় দেখাইতেছে দেখিয়া একটা কাগজ চাহিয়া লইয়া আমি লিখিয়া দিলাম, "আমি সব করিয়াছি, সব কিছুরই জন্য আমি দায়ী; এরা সব নির্দ্দোষী।" পড়িয়া একটা সার্জেণ্ট বলিল, "Noble fellow!" সে স্তুতিও আমার কাণে আজ বিষ ঠেকিল।

তাহার পর রামসদয় মুখুয্যে আসিলেন, ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশন বিভাগের বড় সাহেব প্লাউডেন আসিলেন। প্লাউডেন বলিলেন, "বারীন্দ্র! তুমি কত বড় লোকের ছেলে, তুমি এমন কাজ করেছ? আমি তোমার বড়দাদা বিনয়কে খুব চিনি। ছি! ছি! একি কাণ্ড।"

আ। সাহেব, আমি তো সব অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি, সব নিজেই দেখিয়ে দিলাম। তবে আমায় এমন টানা হ্যাঁচড়া করছো কেন, সার্জ্জেণ্ট গালাগালি দিচ্ছে কেন?

প্লা। A man in your position should not expect too much. তোমার অবস্থায় যে পড়েছে, তার এর বেশী ভদ্রতা আশা করা উচিৎ নয়।

আমি বুঝিলাম আজ হইতে ন্যায়বিচারের এত বড় গর্ব্বী ইংরাজের ঘরে লাঞ্ছনাই আমার নিত্য প্রাপ্য খোরাক। ইহার পর জেলখানায় পাঠানের লাথি খাইয়াও বৃথা মানের কান্না কখনও কাঁদি নাই ; নীরবে সব সহিয়াছি। দেশ ভরিয়া বিপ্লবের আয়োজন যে করে, তাহার সে মরণের অগ্নি লইয়া দুরন্ত খেলায় মান সম্ভ্রম, ঘর দুয়ার, সুখ-সামগ্রী সবই পুড়িয়া ছাই হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? আমাদেরও হইল ; কিন্তু যাহা এমন অনিবার্য্য তাহা সহিবার মত শান্ত উদাসীন সর্ব্বত্যাগী মন আমাদের ছিল না বলিয়া, সহিতে গিয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছিলাম। তবু যে কোন গতিকে সহিয়াছিলাম তাহা সেই মহাপুরুষ লেলের সাধনার গুণে, যাহা আমার কর্ম্মের মধ্যে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনে গ্রহণ হইল না, তাহা বিপদে রাজদ্বারে মৃত্যু শিয়রে করিয়া গ্রহণ করিতে হইল। "যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।" কিন্তু এতবড় সর্ব্বনাশ করিয়া—পথহারা গৃহহারা দেশান্তরী করিয়া ভগবান বোধহয় তাঁহার খুব কমই যাজককে ধরা দিয়াছেন। আমার জীবনে ধরা যে কখনও দেবেন, বার বৎসর দ্বীপান্তর ভোগের পর আজও তাহার শুধু সাধনা চলিতেছে ; তবু এ ভগবান নাকি সহজ!

১০

অপরাধ স্বীকার কেন করিলাম?

বোধ হয় বেলা চারটার সময় আমাদের ধরিয়া চালান দিল। ছেলেদের লালবাজারের পুলিশ লক-আপে রাখিয়া আমাকে কোথা দিয়া কোথায় লইয়া গেল, আজ আর তাহা মনে নাই। লালবাজার হইতে একজন বাচ্চা সার্জেণ্ট সঙ্গে দিয়া আমাকে ডিটেকটিভ অফিসে পাঠান হইল। সার্জেণ্টটি নিতান্ত নাবালক, বয়স বোধ হয় ষোল কি সতর, সেই দুগ্ধপোষ্যের হাতে আবার গুলি ভরা পিস্তল! কলিকাতার জনবহুল রাস্তা দিয়া সে আগে আগে চলিল, আমি হাঁটিয়া তাহার পিছু পিছু চলিলাম। পলাইলে বোধ হয় গুলি করিত, লাগিত কি না লাগিত, সেটা ভগবানের হাত। তবু পলাইলাম না, বলিয়াছি তখন আমি মরিয়া—বড় অভিমানে ক্ষোভে ব্যর্থ আশার খেদে স্থির করিয়াছি, এ বিষ কণ্ঠ ভরিয়াই আমি পান করিব। তাহার ইঙ্গিতে ট্রামে উঠিলাম, কত চাকুরীজীবী তখন সেই ট্রামে আশে পাশে ঘরে ফিরিতেছে, কত হোমরা-চোমরা চশমাধারী চেন-বাহারী বাবু অৰ্দ্ধ নিমিলিত নয়নে আনমনে চুরুট খাইতেছেন। তাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের পাশে আজ বারীন্দ্র বন্দী হইতে চলিয়াছে। জানিলেই বা কি? ভারত কি রাশিয়া না আয়র্লণ্ড? তখন আমি মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে বুঝিলাম, মনের খেয়ালে এতদিন সবই করিয়াছি, শুধু দেশকে গড়ি নাই। যাহার জন্য রাজনীতিক মুক্তির এত আয়োজন, আত্মবলির এ অনুপম ব্রত, সে দেশই মুক্তির মৰ্ম্ম বুঝে না। মনে হইল আগে যাহা করি নাই, এখন ধরা পড়িয়া এ কয়টা জীবন

ফাঁসী কাঠে দিয়াই বোধ হয় তাহা করিতে হইবে। আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতক হস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণ-ভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না। আমার সংকল্প আরও অটল হইল, আমি এতটা পথ চলিয়াও তাই সে বালকের কাছ হইতে পলাইলাম না। সে তো আর তাহা জানিত না, তাই যাইতে যাইতে তাহার চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার গতি-বিধিই দেখিতেছিল, হাতটা তার পকেটেই পিস্তল আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ডিটেক্‌টিভ অফিসে গিয়া বারান্দায় আমায় দাঁড় করাইয়া বাচ্চা সার্জ্জেণ্ট ভিতরে রিপোর্ট দিল এবং পরে আসিয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পর সেই অবস্থায় সেইখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর, ভিতর হইতে হঠাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে রামসদয়বাবু বাহির হইলেন; যেন আমার এরূপ অপেক্ষা করার ব্যাপার কিছুই জানেন না, এমন ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে! তাইতো, তোমায় এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে! এসো বাবা, এসো! তোমরা দেশের রত্ন, কি কাজটাই করেছ! এরও পর শালারা আর আমাদের কাপুরুষ ভাববে, অপমান করবে! এসো বাবা, এসো বসো।" তাহার পর চেয়ার, পান, সুপারী, চা, জলখাবার, কোন নৈবেদ্যেরই ত্রুটি রহিল না। শেষে কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া এ প্রশ্ন, সে প্রশ্ন, কত গালগল্প; যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বলা, "এই বারীন্দ্র, দেখে যাও! I say Jones, here is Barindra!" কত পুলিশ ইন্সপেকটর, সাহেব সুবা কেহ প্রকাশ্যে ঘরে ঢুকিয়া কেহ উঁকি মারিয়া কেহ ট্যাড়া গর্ব্বিত নজরে, কেহ সহাস্য-আদর আপ্যায়নে আমাকে দেখিয়া গেল। আর প্রায় রাত ১টা অবধি "দিদিশাশুড়ী" রামসদয়ের জেরা ও আদর সমান বেগে চলিতে লাগিল! গলদঘর্ম্ম হইয়া বেচারী যায় আর কি? আমায় সব কথা স্বীকার না করাইলে এতবড় মোকদ্দমার কূল-কিনারা হয় না। তাহার পর এখনও গলি

ঘুঁজি-অন্ধি সন্ধিতে কোথায় কত বোমা পিস্তল পোঁতা আছে, কত প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরাম হুম্‌পটাস্ বগলে সাহেব সুবোর স্বর্গবাসের ব্যবস্থার জন্য ঘুরিতেছে কে জানে।

সব সওয়ালে আমার ঐ এক কথা, "উপেন, উল্লাস, হেমচন্দ্র, বিভূতি, ইন্দু সবাইকে আন, পরামর্শ করি, তাহার পর বলিব। কিন্তু যতটুকু প্রচারের জন্য দরকার, নির্দ্দোষকে বাঁচাইতে দরকার, নিজের নিজের কীর্ত্তিকলাপ দেশকে শুনাইতে দরকার তাহাই বলিব, বেশী বলিব না।" অগত্যা পরদিন সকালে উপেন ও উল্লাস আসিল, তর্ক-বিতর্কের পর তাহারা রাজী হইল। আমি বলিলাম, "আমরা তো মরিয়াছিই, একবার এসো শেষ প্রচার করিয়া যাই, দেশকে শুনাই যে কেমন করিয়া এ পন্থা ধরিতে হয়, এ সাধনা সাধিতে হয়, এ ব্যূহ গড়িতে হয়। আরো দেখাও কেমন করিয়া আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া মরিতে হয়, ইংরাজের রাজদ্বারে, কারাগারে বধ্যমঞ্চে নিঃশঙ্ক নির্ভীক থাকিতে হয়।" এই কথায় সবাই ভিজিল, কারণ সবাই-ই সমান অগ্নিমূর্ত্তি, সমান বেপরোয়া, সমান পাগল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এসব পরদিন সকালের ঘটনা; সে রাত্রে রামসদয়, পূর্ণ লাহিড়ী ও রামকৃষ্ণ মঠের ভক্ত এক সি আই ডি ইন্সপেক্টর আমায় গল্পে গুজবে বহু কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি আমরা ভাবিয়াছিলাম ইংরাজ রাজত্বটা বম্‌বাজী করিয়াই দখল করিব? আচ্ছা, তাহা না হয় নাই হইল, ভয় দেখাইয়াই রাজনীতিক সর্ত্ত আদায় করাই না হয় ইহার লক্ষ্য হইল, কিন্তু এত বুদ্ধি আমাদের দিল কে? রুশ গভর্ণমেণ্ট কি ইহার পিছনে আছে? দু' দশটা রাজা গজা? তাও নয়। আচ্ছা, গাইকোবাড়? ইত্যাদি প্রশ্নের ঝড়ে প্রাণ বাঁচাইয়া আমি কোন গতিকে সে রাত্রি একটা বাজাইলাম। আমার জন্য সি আই ডি অফিসেই একজন কনষ্টেবল খিচুড়ি রাঁধিয়া-ছিল, টেবিলের উপর একটা থালায় আমায় তাহাই দিয়া গেল। সঙ্গে কি ভাজা বা তরকারী ছিল মনে নাই কিন্তু ভোজপুরীর রাঁধা

সেই খিচুড়ি সমস্ত দিনের উপবাসের পর পরমান্ন বোধে খাইলাম। শুইতে দিল দুগ্ধফেননিভ কুসুমকোমল পালঙ্ক, সামনেই খোলা জানালা ও কলিকাতার রাজপথ। নির্ব্বিবাদে শুইয়া আছি আমি ফাঁসীর আসামী—শত্রুপুরীর মাঝে—খোলা জানালা সম্মুখে করিয়া! সে কি সাধে? মশারীর বাহিরে একজন বন্দুকধারী ভুঁড়েল পাহারা-ওয়ালা আমার শায়িত অঙ্গের দিকে লোলুপ নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রে কতবার ঘুম ভাঙ্গিল, প্রতিবার কাণে বাজিল কোথা হইতে সেই বাগানে ঘরের চারিপাশে পূর্ব্ব রাত্রির খস্ খস্ জুতার শব্দ! পরে জেলখানায়ও কতবার ঐ শব্দ শুনিয়া হিম-অঙ্গ হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছি, এত নির্ভীক আমারও nervous beingএর স্নায়ুরাজ্যের কোথায় সেই শব্দ আমার অগোচরে একটা ওলট-পালট ঘটাইয়া-ছিল। আমার মন প্রাণ চিত্ত সে সংবাদ রাখিত না বটে কিন্তু ঘুমাইলেই কোথা হইতে সেই শব্দ বাজিয়া উঠিত, আরও আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত। এই ধাক্কা (nervous shock) সামলাইতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। সে রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙ্গিল, প্রতিবারই সেই লোভনীয় গবাক্ষ পথ একদিকে, আর অনিদ্র সশস্ত্র লালপাগড়ীর খাড়া লাস আর একদিকে। আশা সাধ আকাঙ্ক্ষা-ভরা প্রাণের কোথায় যেন হা হা করিয়া উঠিতেছিল, তখনও যে পাগলের মনের কোন সাধই পুরে নাই, স্বপ্ন যে স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে। সাধক কবি ইন্দুভূষণ সত্যই বলিয়াছেন—

"ও বড় আদরের ঘরণী আমার কামনা।
আমি দিবানিশি খাটি তবু পোরে না তার বাসনা।"

মনের ফরমাইস খাটিয়া খাটিয়া এ দুনিয়ায় সত্যই কেহ কূল পায় নাই, কারণ মনও আপন কোটে একটি ছোটখাট সাগর, তাহার লহরীমালারও ইতি নাই। আসলে আমাদের পরমধামের সেই অন্তর-সাগরই মনের কূলে ঢেউ দিতেছে। এতদিনে জীবনের নৌকায় পাড়ি জমাইয়া যাহা বুঝিয়াছি, তখন অতটা বুঝিলে, বোধ হয় সে

খেলাটা অমন করিয়া চলিত না, আমার মত ভাঙ্গা কূলায় করিয়া ছাই ফেলা ভগবানের আর হইয়া উঠিত না।

পরদিন সকালে প্রথমে উপেন, উল্লাস আসিল। পরামর্শ করিয়া আমরা স্থির করিলাম, আমি, উপেন, বিভূতি ও ইন্দু সমস্তই নিজের ঘাড়ে লইয়া সব স্বীকার করিব। হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সে রাজী হয় ভালই, না হয় আর কাহারো নাম করা হইবে না। হেমচন্দ্র আসিল এবং কোন কথাই স্বীকার করিতে রাজী হইল না। সে সংসারের পাকা ঝানু জীব, অনেককাল পাউণ্ড ইন্সপেক্টর রূপে পুলিশ চরাইয়া খাইয়াছে, সে বরঞ্চ আমাদেরই এই বেকুবি করিতে মানা করিল। পুলিশ বে-গতিক দেখিয়া তাহাকে সরাইয়া লইল! তাহার অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ রামসদয় একটা কাগজ হাতে আনিয়া বলিল, "তোমরা বল হেমচন্দ্র স্বীকার করবে না, এই দেখো সে স্বীকার করেছে।" আমরা তো হতভম্ব! সেটা যে কি, সত্য সংবাদ কিনা, কি সংবাদ দিল, তাহাতে কি আছে, কিছুই দেখিলাম না, এ ওর মুখ চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আমাদের লেখা স্বীকার পত্রের বিবরণে তাহারও কীর্ত্তি-কলাপ জুড়িয়া দিলাম।

নিজের অনুষ্ঠিত এতবড় লোভনীয় রণরঙ্গী ব্যাপারখানা বলিতে বসিয়া মানুষের বলার রোখ চাপিয়া যায়। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে, দেশের জন্য আমরা যে শৌর্য্য বীর্য্য ত্যাগ তপস্যাই করি না কেন, তাহা যে বার আনা আশার নেশারই মৌতাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন তাহা বুঝি নাই, কারণ তখন সংযমের বয়স নয়, তখন জীবনের চৌরাস্তায় যোল ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইবার বয়স। জেলখানায়ও ধর্ম্মঘটের পালায় দেখিয়াছি—অতি বিজ্ঞ প্রবীণ প্যাট্রিয়ট অবধি সস্তায় বাহাদুর সাজিবার এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না, কমিশনার বা সুপারিন ঠনঠন সাহেবের নাকের কাছে দু'হাত নাড়িয়া দু'কথা গরম গরম শুনাইয়া দিবার প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের অনেকেই সাজার উপর

সাজা ভোগ করিতেন। যে বুদ্ধিমান নিজের জিহ্বা সংযমের ফলে জিতিয়া গিয়া শ্রীঘরেও শ্বশুর বাড়ীর একটা নকল সংস্করণ গুছাইয়া লইয়াছে, তাহার উপর এই আত্মদোষে বিড়ম্বিতের দল বড় নারাজ। এই প্রকারে আত্মকীর্ত্তি রাখিতে গিয়া খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলা হইয়াছিল; তাহার শ্রাদ্ধ যে কতদূর গড়াইবে, তাহা তখন কেবল অন্তর্য্যামীই জানিতেন, আমরা বুঝি নাই।

তাহার পর বেলা তিনটার সময় বার্লি সাহেবের কোর্টে—আমরা গাড়ী বোঝাই হইয়া পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেবের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, বিধিমত আসামী নথিভুক্ত হইবার পর—পাত্রসাৎ হইলাম। প্রথমেই আমার পালা, গিয়া দেখি 'মার্ব্বেল পাথরের পালিশ করা' নিটোল কঠিন মুখ লইয়া মূর্ত্তিমান আইন দেবতা কাষ্ঠাসনস্থ হইয়া কপিশ চক্ষে আমায় দেখিতেছেন। কৃষ্ণের সে জীবটিকে দেখিয়া আমার অন্তরে কৃপার উদয় হইল, মনে হইল, "মানুষ আসলে কি একটা বিরাট ফাঁকা আওয়াজ! এতদিন আমরা করিলাম বীরত্ব, এইবার এই মদ্দরামের পালা!!"

সাহেব আমায় বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—তাঁহার তুল্য বিগ্রহধারী পেনাল কোডের কাছে কোন কথা বলিলে তাহা আমার সমূহ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে, সুতরাং বুঝিয়া সুঝিয়া সজ্ঞানে বাহাল তবিয়তে আমি যেন তাঁহার প্রেমাঙ্ক আশ্রয় করি। আমি বলিলাম, "আমি তাহা ভাল রকমই জানি, তবু আজ তাঁহাকে কষ্ট করিয়া এ অভাগীর মর্ম্মকথা শুনিতে হইবে; আজ সেরেফ পাথরের দেয়ালকে শ্রোতা রূপে পাইলেও আমি বক্তৃতা না দিয়া ছাড়িব না।" তাহার পর আমার তথাকরণ ও ঘাড় গুজিয়া সাহেবের তাহা লিপিবদ্ধ করণ। সে আইনের খাস-কামরায় তখন মাত্র কয়েকজন কাগজের রিপোর্টার, দুই একটি ছিন্ন-শামলা out-at-elbow উকিল ও যথারীতি দারোগা, সি আই ডির পাল উপস্থিত। মনে বড় দুঃখ হইল

এই ভাবিয়া যে, এ অভাগা দেশে আজ আমার এমন আরব্য উপন্যাসের পালা শুনিবার একঘর শ্রোতাও জুটিল না রে। একে একে আমরা আপনার মাথা আইনের হাড়িকাঠে আপনি রাখিয়া স্বহস্তে কাটিলাম; এই ছিন্নমস্তাইপালার পর প্রায় সন্ধ্যার মুখে যাত্রা করিলাম শ্বশুরালয়ের রাজকীয় সংস্করণ আলিপুর জেল অভিমুখে। এত কাণ্ডের পর তখন প্রাণটা একটু দমিয়া যাইবার হুকুম চাহিল, বলিল, "এ পালার সবটা ভাল, এইটা ছাড়া।" ধরা পড়ার চেয়ে যে দাঁড়াইয়া মরা কত সহজ, তাহা ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বেশ দীর্ঘ রকমেরই পড়িল। কিন্তু জেলখানার বিরাট ফটক দেখিয়া আমার ফেরারী সাহস আবার ফিরিল। ভাবিলাম, "প্রহসনটা শেষ অবধি দেখিয়া মরিতে ক্ষতি কি? আজ আমিই না হয় এর গোড়া, প্রথম বলি; একদিন তো সবার ভাগ্যেই এই দড়ি, এই খোঁটা, এই ঘাসজল আর তাহার পর অন্তিমে শ্রীদুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়াই আছে। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

১১

কেন ধরা পড়িলাম ?

আমরা ধরা পড়িলাম কেন ? আমরা যেভাবে চলিতাম ফিরিতাম, কাজকর্ম্ম উদ্যোগ আয়োজন করিতাম, তাহাতে ধরা না পড়াটাই যে আশ্চর্য্য, অত দিন যে ধরা পড়ি নাই এবং নির্ব্বিবাদে কাজ করিতে পাইয়াছিলাম, তাহাই এক আরও পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। এ হেন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল কেবল পুলিশ ও আমাদের উভয় দলেরই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য। যখন নারায়ণগড়ে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেণ উড়াইবার অতবড় ব্যাপারটা ঘটে, তখন বাঙলা সরকারের চরবিভাগ ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই যে, এ ব্যাপারটার মত একটা নিদারুণ উপদ্রব এদেশের শান্ত সুবোধ ভদ্রলোকের দ্বারা কিরূপে হইতে পারে। তাই সে মোকদ্দমার কূল কিনারা একটা না করিলে ঝাড়ে বংশে তাহাদের চাকুরী যায় দেখিয়া, জন চৌদ্দ রেলকুলীকে গুঁতা-গাঁতার চোটে স্বীকার করানো হইল যে, তাহারাই বাঙলার লাট সাহেবের পরলোকে সদগতি করিবার জন্য এ হেন ব্যবস্থা করিয়াছে।

কখন যে গোয়েন্দাবিভাগের বড় কর্ত্তার সপ্রেম নেকনজর আমাদের উপর প্রথম পড়িল তাহা জানি না ; তবে ইহার জন্য অনেক আগেই যে পড়া উচিত ছিল তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা যখন এক দেড় বছর "যুগান্তর" চালাইয়া হঠাৎ তাহা অন্য দলের হাতে দিয়া সরিয়া পড়িলাম, তখন একটি প্রবন্ধে বেশ স্পষ্ট কথায় দেশবাসীকে বলিয়া গেলাম যে, "একদিন যাহা কাগজে লিখিয়াছি,

এইবার তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইব বলিয়াই, আমরা একদল কাগজ হইতে আজ হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম।" "যুগান্তর" কি বলিত না বলিত গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতেন, আজ হইলে অমন কথা কেহ তিন বারের বেশী বলিয়া পার পায় না। ধৃত আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ ও ঘেরাও হইয়া হাড়গোড় ভাঙ্গা দ অবস্থায় কাঠগড়ায় হাজির হয়। সে দিন তাহা কেন হইত না? তাহার একমাত্র কারণ এই যে, অনেককাল নির্ব্বিবাদে সুখে রাজত্ব করিবার ফলে কর্ত্তারা দিব্য আরামে নাকে সরিষার তৈল সংযোগে ভোগ-নিদ্রালস দশায় অবস্থান করিতেছিলেন। সে নিদ্রা আর এক বৎসরব্যাপী হইলে কি ঘটিত বলা যায় না, কারণ আমরা হাজার আনাড়ী হইলেও ইংরাজি কেতাব প্রসাদাৎ রাজত্বরূপ পোয়ালগাদায় আগুন লাগাইবার অনেক কল কৌশল শিখিয়া-ছিলাম।

আমাদের বাগানে কলাটা, মুলাটা, ফলটা, পাকড়টার লোভে একদল হনুমান মাসে তিনবার কি চারবার করিয়া দেখা দিত। মুরারিপুকুর অঞ্চলময়ই কেবল সারি সারি বাগান, এই রামানুচরদল পালাক্রমে এইসব বাগানে এক দুই দিন বাস করিত এবং গাছে গাছে কায়ক্লেশে দিনগুজরান করিত। আমরা একটা ছোট রাইফেল লইয়া তাহাদের পালের গোদাকে ঘায়েল করিবার প্রয়াস প্রায়ই করিতাম। গ্রেপ্তার হইবার কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই দেখিতাম, ঠিক পাশের বাগানে একদল লোক রোজ বসিয়া হল্লা করে ও আড্ডা দেয়। আমরা জানিতাম না যে, এই বাগান পুলিশে ভাড়া লইয়াছে, আমরা ভাবিতাম—ইহারা জুয়াড়ী, পুলিশের জ্বালায় এইখানে একটু নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া নশ্বর জীবনের রসাস্বাদ করে মাত্র। এই হইল আমাদের দ্বিতীয় নম্বর গাফলতি, প্রথম নম্বর যে "যুগান্তরে"র স্তম্ভে সাধারণ নোটিশ দিয়া গুপ্তসমিতি গড়িতে নামা, তাহা পূর্ব্বেই এক রকম বলিয়া চুকিয়াছি।

এইবার হইতে পুলিশ আমাদের পথে ঘাটে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশের গোয়েন্দাবিভাগের জীবগুলি সমাজের যে স্তর হইতে সচরাচর সংগৃহীত হয়, তাহাতে তাহারা যে খুব বুদ্ধিমান, কৌশলী ও স্থিরমতি হইবে, তাহা অনুমান হয় না। ফলেও দেখিয়াছি তাহাই। আমাদের মত পুলিশ সম্বন্ধে আনাড়ী বেপরোয়া ভাবুক আইডিয়ালিস্টের দলও যে মাঝে মাঝে পথ চলিতে চলিতে টের পাইত তাহার পিছনে কপট নিঠুর বাঁকা চোখের আবির্ভাব হইয়াছে, এটা চরবিভাগের কম কলঙ্কের কথা নয়। যদি হাতে টাকা থাকিত প্রচুর, আর আমাদের বয়সটা হইত চল্লিশ পার, তাহা হইলে এই টের পাওয়ার ফলে, সমস্ত গুপ্তসমিতিটা ক্রমে ক্রমে তাহাদের চোখের সামনে শ্যাওড়াগাছের যক্ষিণীর মত উপিয়া যে কোন গোপন আঁস্তাকুড় আশ্রয় করিত তাহা বলা কঠিন। আজ পণ্ডিচারীতে বসিয়া এই গল্প লিখিতেছি, আজও মহামান্য মাদ্রাজী গভর্ণরের আটটি উপদেবতা আমার জানালার বাহিরে বসিয়া, মনের আনন্দে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। আজ বলিয়া নহে, একাদিক্রমে এই বারো বৎসর তাহারা ঐখানে ঐ অবস্থায় বসিয়া ঐ কুকার্য্য প্রকাশ্যভাবেই করিতেছে। আমরা জানি উহারা গোয়েন্দা, আর উহারা জানে আমরা স্বদেশী মার্কা বাঙালী, সুতরাং সুসময় ও সুবিধামত উহাদের ভক্ষ্য এবং সর্ব্বদার জন্য আইনতঃ উহাদের দুই চক্ষুর অগোচর করিবার নহে। "জনন অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল";—কত মাস কত বর্ষ অতীতে চলিয়া পড়িল, কত দলের পর দল ইহারা সহ-ইন্সপেক্টর বদলি হইল, তবু ইহাদের এ চাহনীর পিপাসা গেল না! এ গোপন-বঁধুদিগের দিব্য দিবালোকের প্রহসন দেখিয়া দেখিয়া তাইতো মনে এই ভাবিয়া বড় ক্ষোভের উদয় হয় যে, আমাদের পোড়া দেশে পুলিশে গোঁফ-দাড়ীদুষ্ট পুরুষ ছাড়া কেহ ঢুকিতে পায় না! নহিলে আজ তো আমরা বৈধ উপায়েই ষোল শ' সখি লইয়া কানু (by compulsion) হইয়া

বিরাজ করিতাম। এমনতর বোকামী কিন্তু মাদ্রাজেই সম্ভব, বাঙলার গুপ্তচর ইহাদেরও সাত বাজারে বেচিতে পারিত।

তখন উষ্ণরক্তের ডোণ্টকেয়ার বয়স আর পুলিশ সম্বন্ধে ছিলাম অনুপম রকমের অজ্ঞ ও বে-পরোয়া। "পুলিশ! ফুঃ!! ওরা আবার কত বল কত বুদ্ধি ধরে?" তাই তো বলিতেছিলাম, উভয় দলের গোঁয়ারতামী ও নির্ব্বুদ্ধিতার জোরেই আমাদের অতদিন নির্ব্বিবাদ কর্ম্মভোগ, এতবড় দুরভিসন্ধি ও দুঃসাহস এমন খোলাখুলি চালে চালাইলে সন্দেহভাগী হইতে দেরী ত হয়-ই। তাহার পর যখন দুই একটা দুম্ পটাসের সোরগোলে ন্যায়-দৈত্যের প্রেমদৃষ্টি নিতান্তই আকর্ষণ করিলাম, আমাদের পিছু পিছু একটু অমনি যাহাহউক গোছের আড়ঘোমটা আড়াল দিয়া আড়নয়নের অভিসার যখন আরম্ভ হইল, তখনও বাঁচিতে পারিতাম; যেটুকু বুদ্ধি ও চতুরতা ছিল তাহাতেও এই (Open Secret Society) হাটুরে গুপ্ত সমিতি অবশেষে সত্য সত্যই গুপ্ত হইয়াই পড়িত, যদি হাতে প্রচুর রসদ অর্থাৎ টাকা থাকিত। প্রত্যেক কাজটি আলাদা রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্মীদেরও পরস্পরের অজ্ঞাতে গড়া যে কত টাকার খেলা তাহা সহজেই অনুমেয়। সে সময়ে বড় বড় কাপ্তেনরা ৫।১০ টাকা চাঁদা দিয়া লিডার হইতেন, আর ড্রইংরুমে বসিয়া বুভুক্ষু কর্ম্মশ্রান্ত আমাদের উপর ফরমায়েস করিতেন লাট-বেলাটের তাজা মুণ্ড। তাঁহাদের কেহ কেহ এখন পুত্র কলত্র লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসার ধর্ম্ম করিতেছেন, কেহ কেহ এখনও বড় বড় ন্যাতা। একজন এহেন কাপ্তেন একবার এক হাজার টাকা এই সর্ত্তে দিয়াছিলেন যে, আমরা ক'জনায় মিলিয়া যেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করি। বহু চেষ্টায়ও যখন সতর্ক মাছ জালে পড়িল না, অথচ স্থানে স্থানে তাড়া করিয়া বেড়ানর ফলে টাকাটি খরচ হইয়া গেল তখন এই ধনীপুত্র কুলের দুলাল আমাদের কাণ মলিয়া সেই এক হাজার টাকা আদায় করিয়া লইলেন। আমরা

অনাহারে অনিদ্রায় হাড়ভাঙা পরিশ্রমে অত কাজ করিয়া আবার বার বৎসর দ্বীপান্তর-বাস-সুখও সহিয়া আসিলাম, আর তিনি আজ সহরের একজন খ্যাতনামা ধনী, গায়ে তাঁহার আঁচড়টি অবধি লাগে নাই। তখন এই ছিল আমাদের দেশ, যাঁহাদের আশ্রয় করিয়া আমরা সেকালে বোমার যুগের বিলাতী-গুপ্ত-কথা আরম্ভ করি। উপেন তাই তাহার নির্ব্বাসিতের আত্মকথায় সত্য কথাই লিখিয়াছে,— “সুদূর আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নীরবে সমস্ত লজ্জা, অপমান, নির্য্যাতন সহ্য করা যে কত কঠোর সাধনাসাপেক্ষ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে না। দেশের সে শিক্ষা তখনও হয় নাই; এখনও হইয়াছে কি?”

বহুকালের অধীনতার ফলে, জাতীয় জীবনের দায়িত্বহীনতার ফলে ও পরনির্ভরতা এবং পরানুকরণ প্রসাদাৎ এ জাতি আজ যে কতদূর শক্তিহীন তাহা গঠনের দিন ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। যে দুর্ব্বল ও ভীরু, মনের বল যাহার নাই, তাহাকে দিয়া লড়াই করাইতে হইলে মদ খাওয়াইয়া নেশায় রাখিতে হয়। যতক্ষণ নেশা ততক্ষণ সে বীর, তাহার পর নেশা কাটিয়া গেলে তাহার আর পদার্থ থাকে না! এ জাতিরও তাহাই বর্ত্তমান দশা, তাই দেশের কাজে এত ইমোশান উত্তেজনার মদ দরকার হয়; এক বছরে স্বরাজ পাইবে এ আশা না দিলে কম মানুষই তাই কাজে হাত দিতে চায়। ভাগ্যে ইংরাজের গুঁতাটা গাঁতাটা ছিল আর বাঙ্গালীর কীর্ত্তনে নাচা ভাবুক প্রাণ ও হৃদয়টা ছিল, নহিলে এ দেশের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা বলা দুষ্কর। তখন বিপ্লবপন্থী লীডারও গরম গরম বোমাবাজী না দেখিতে পাইলে সহজে টাকার থলিতে হাত দিতেন না, তাঁহাদের সখের পলিটিক্যাল গুণ্ডাবাজীর আমরা ছিলাম ভাড়াটে গুণ্ডা।

কিছুদিন পিছু পিছু ঘোরাঘুরি করিবার পর আমাদের অবিনাশকে রন্ধ্র করিয়া ভিতরে শনি ঢুকিবার একটা বড় রকমের চেষ্টা হইয়া গেল। এই শনির নাম রজনীকান্ত, বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার কোন একটি

গ্রামে। যতদূর মনে আছে মানুষটা কাল, বেঁটে, কুৎসিত-দর্শন ও মিষ্টভাষী। একদিন সে অবিনাশকে ধরিয়া বসিল এই বলিয়া যে, সে দেশের জন্য প্রাণ দিবে, আমাদের নাকি কি গুপ্ত আড্ডা আছে, তাহাতে তাহাকে লওয়া হউক। অবিনাশ তাহাকে আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিল, আমি দশ পনর মিনিট আলাপ করিয়া বলিলাম, "আমাদের তো কোন আড্ডা নাই, তবে ভবিষ্যতে হইলেও হইতে পারে; তখন দেখা যাইবে।" তাহার পর সে কোন উপায়ে বাগানের সন্ধানটুকু পায়, কিন্তু ভিতরে না লওয়ায় বাগানে যাইতে পায় নাই। আমার বিশ্বাস এইখানে পুলিশ সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাইল যে, আমরা আড্ডা গাড়িয়াছি এবং তাহার আসলটা বাগানেই বটে। তাহার আগে পিছু পিছু বটকৃষ্ণ পালের দোকান অবধি গিয়াছে, চন্দননগরে তার্দ্দিভালী বোমা পার্টির অনুসরণ করিয়াছে। মোকদ্দমায় পুলিশ কিন্তু এ রজনীকে হাজির করে নাই, তদবধি সে জীবনের ভয়ে নিরুদ্দেশ। তখন কোন প্রকারে তাহার গতিবিধি প্রকাশ পাইলে আমাদের প্রথম দলের হাতে সে নিশ্চিতই অপঘাতে মরিত। একেবারে ডুব মারিয়া সে বাঁচিয়া গেল।

যে রাত্রে ধরা পড়িব সেই রাত্রে প্রায় দশটার সময়ে একজন সেই বিটের (beat) হেড কনেষ্টবল ঐ পথে যাইতে একবার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেদিন রাত্রে যে বাগানে খানাতল্লাসী হইবে কাণাঘুসায় তাহার বাষ্পগন্ধ এই ব্যক্তি বোধহয় টের পাইয়াছিল। পথে যাইতে সে বাগানে একটা ঢুঁ মারিয়া আমাদের শাসাইয়া গেল। আমি বাহিরে আসি নাই, পরেশ কি আর কাহাকে বাহিরে পাইয়া ভোজপুরনন্দন কড়া কড়া কথায় চড়া আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখানে কি কর?"

প। আমরা সাধু ফকির, যোগ-যাগ করি।

ভোজ। হুঁ! আচ্ছা দেখা যাবে, তোমরা যোগ কর কি, কি কর তা শীঘ্রই বোঝা যাবে।

তখনও আমার একবার মনে হইল, "কাজ নাই দেরী করিয়া, বেটারা ঘুরাফিরা করিতেছে, আজ রাত্রেই সরিয়া পড়া যাক।" কিন্তু ভবিতব্য যাইবে কোথা? তাই সে সুমতি জুটিয়াও বেশীক্ষণ টিঁকিল না। মানুষ লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া নিজেকে চতুর চূড়ামণি ঠাওরাইয়া চলে বটে, কিন্তু পড়িবার সময় বুদ্ধির দড়িতে এমনি জট পাকাইয়া যায় যে, অতি সহজ সরল জিনিসটা একেবারেই বাঁকা হইয়া চক্ষে পড়ে।

যখন ধরা পড়িয়া গাছের তলায় কোমরে দড়িবাঁধা দশায় শুইয়া আছি তখন কোথা হইতে এক ত্রিশূলহস্তা শীর্ণকায়া সন্ন্যাসিনী হঠাৎ আসিয়া হাজির। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল বাঙলার অশিক্ষিত স্তরের কোন যোগিনী কি বৈষ্ণবী হইবে। মেয়ে কিন্তু অকুতোভয়, সরাসরি দারোগার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বাবা, এরা কি করেছে?" দারোগা হিন্দুস্থানী, সবে ভাঙা ভাঙা বাঙলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে মেয়েমানুষ দেখিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "এরা চোর আছে।"

স। আহা! চোর এরা? তা যাক্, তোমার এই এতটা ব্যালা অবধি চান হয়নি, তেল গামছা পাঠিয়ে দেব। আমার আস্তানা এই কাছেই।

দারোগা তো জল! তাহার পর ত্রিশূল হাতে সে মেয়ে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! কি করেছ তোমরা?"

আ। কিছুই করিনি।

স। আহা! তা', আমি নাম দিচ্ছি, এই নাম জপ কোরো, তোমার বাঁধন থাকবে না।

আ। দিন, কি নাম?

স। ওঙ্কারজী গুরুমহারাজ।

আ। তিনি কোথায় আছেন?

স। তিনি সব জায়গায় আছেন।

শেষে ছেলেদের মুখে শুনিলাম লালবাজারের পুলিশ হাওলাতে (Lock-up) সেই সন্ন্যাসিনী আমাদের দেখিতে নাকি গিয়াছিল ও ত্রিশূল হাতে গোরা সার্জ্জেন্টদের মাঝে দিব্য বে-পরোয়া ঘুরিতেছিল, যেন লালবাজার তাহারই শিষ্যবাড়ী।

১২

জেল

জেলের সদর ফটক পার হইয়া আমরা সান্ত্রী সিপাহীর বেড়াজালে জেলে ঢুকিলাম। জেলার বাবু, নায়েব জেলার বাবু, তস্য নায়েব বাবু, বড় হাবিলদার, মেজ হাবিলদার, ছোট হাবিলদার, কালা পাগড়ী, মেট, কত কত চিত্র বিচিত্র জীবসঙ্কুল নবাবী অন্তঃপুরে ভ্যাবাচেকা লাগিয়া, আমরা গেলাম যেখানে, সেটা চোয়াল্লিশ-ডিগ্রি,—অর্থাৎ জেলের মধ্যে আবার আলাদা পাঁচিল ঘেরা খোঁয়াড়ে সারি সারি চুয়াল্লিশটি কুঠরী বা cell, তাই এ খাস মহলের নাম চোয়াল্লিশ-ডিগ্রি। ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে তাপ ওঠে, ছিয়ানব্বই ডিগ্রি হইতে একশ' পাঁচ অবধি, আর সেকালে দেশভক্তি ও রাজদ্রোহ একসঙ্গে করিলে, নসীবের তাপ উঠিত চোয়াল্লিশ ডিগ্রি অবধি। এইখান হইতে রোগী হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত গোছের, নয় ঘানী, নয় কালাপানি, আর নয় ফাঁসীকাঠ প্রাপ্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিত; কারণ সেকালের জেল খাটিয়া বাঁচিয়া ফেরা ভদ্রলোকের কাজ আদৌ ছিল না। যদি বল "তোমরা কি করিয়া ফিরিলে?" তাহা হইলে লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া অগত্যা বলিতে হয়, অভদ্রতা ত দূরের কথা, পশুবৃত্তি পর্য্যন্ত করিয়া, জীয়ন্তে শতমরা মরিয়া, এক রকম ভূত হইয়াই বাহির হইয়াছি।

জেলার বাবু সেই অত রাত্রে জেলের পাকশালা হইতে ভাত আর অড়রের ডাল আনাইয়া দিলেন, লোহার থালে লোহার বাটিতে তাহা পরম অমৃত বোধে খাইলাম, কারণ ক্ষুধার মুখে গো-ভোগ্যও যে

পরমান্ন, তাহা জেল না খাটিলে বোঝা যায় না। কুঠরীর মধ্যে এক এক ঘরে এক এক জন বন্ধ হইল, কেবল বোধহয় পালের গোদা আমি, উপেন ও হেমচন্দ্র নিজের নিজের কুঠরীতে দুই দুই জন করিয়া সঙ্গী পাইয়াছিলাম। অতটুকু ঘরে সঙ্গী না থাকাও বিপদ, আবার থাকাও বিপদ। ঘরের কোণে একটি করিয়া আলকাতরা মাখা টুকরি আর খানিকটা মাটি, বলা বাহুল্য এইটি আমাদের শৌচাগার। "লজ্জা মান ভয়, তিন থাকতে নয়"—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উক্তি আমাদের ঘাড়ে না বলিয়া কহিয়া আসিয়া এমন করিয়া সওয়ার হইল দেখিয়া আমি ত অবাক। এখন উপায়? অগত্যা ছেলেদের বলিলাম, "ওরে, বাপু, তোরা একটু চোখ বোঁজ, আমায় ট্যাক্সো দিতে হবে।"

আমার সহিত একঘরে বোধহয় পূর্ণচন্দ্র সেন ও নরেন্দ্রনাথ বক্সি ছিল। জেলখানায় আমার জীবনে সেই প্রথম নিশাযাপন, বারটি বৎসর ঘুরিয়া এ নিশার যে অবসান হইবে, তখন সে রহস্য কেবল সকল চক্রের চক্রী বিধির মনেই ছিল। রাত্রে তিন ঘণ্টা অন্তর পাহারা বদলি হইতে লাগিল, আর প্রতিবার জুতার শব্দে বাগানের সেই স্মৃতি ঘুমের ঘোরে টনক নাড়িয়া জাগাইয়া দিল। যে বার নিদ্রাদেবী আঁচলখানি আমার সর্ব্বাঙ্গে ঢাকিয়া আমার স্মৃতির জ্বালাও জুড়াইবার উপক্রম করিলেন, সে বার নূতন পাহারাওয়ালা বদলি হইয়া কাজ বুঝিয়া লইবার কর্ত্তব্যবোধে, কম্বল ঢাকা ত্রিমূর্ত্তির সন্নিহিত হইয়া ডাকিল, "এই কয়েদী।" বাকি নিদ্রাটুকু হরণ করিল, ভোর না হইতে গাছের কাক শালিক আর তাহার পর জেলের ঘন্টি।

প্রত্যেক কুঠরীখানি ছোট ছোট পাঁচিল ঘেরা, সামনে একটুখানি করিয়া উঠান। পাঁচিলের বাহিরে পাহারা বদলি আসিবার যাইবার, কুঠরীবাসীদের চোয়াল্লিশ ডিগ্রিসাৎ হইবার বা তাহা ত্যাগ করিয়া জেল ফটকমুখী যাইবার, টানা উঠান। সকালে বড় জমাদার ও একজন নায়েব জেলার আসিয়া সকল কুঠরীর চাবি খুলিয়া দিল,

মেথর আসিয়া প্রস্রাবের টুকরি সরাইয়া নূতন টুকরি ও মাটি জোগাইল, হাত মুখ ধুইবার জন্য ঘরে ঘরে বালতি বালতি জল আসিল। বাহির হইয়া বড় উঠানে মুখ বাহির করিয়া দেখি, ঘরে ঘরের দুয়ারে কৌতূহলী মুখ সব দেখা দিয়াছে, বলা বাহুল্য সবারই পাটি দুই দাঁত সকৌতুকে বাহির করা। দেখিলাম সেখানে বাগানের সবাই আছে, উপেন আছে, উল্লাস, বিভূতি, ইন্দুভূষণ আছে, কানাই, নলিনী, শচীন্দ্র, নিরাপদ আছে, বিজয় নাগ, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সি ও পূর্ণ সেন আছে, তা ছাড়া হেমচন্দ্র ও অবিনাশ আমাদের সে দূরদৃষ্ট-রূপ গগনে সমুদিত। অবিনাশের মুখে শুনিলাম আমার সেজদাদা অরবিন্দও গ্রেপ্তার হইয়া জেলের অন্যত্র খোঁয়াড়ে খোল বিচালি পাইয়াছেন।

সকালের প্রাতরাশ আসিল "লপসী"। আমরা এই অপূর্ব্ব পদার্থটি, এক এক হাতা লোহার থালায় জনে জনে পাইয়া চক্ষু ছানাবড়া করিয়া সভয়ে চাহিয়া রহিলাম। এ আবার কি রে বাবা! পাহারাওয়ালা আশ্বাস দিয়া বলিল, "বাবু খাও, ভাল জিনিস।" তাই তো, এ যে ফেন ভাত, তাহাতে একছিটা লবণ। দু' চার দিন থাকিতে থাকিতে শেষে দেখিলাম এ "লপসী" বহুরূপিনী—কভু পীত, কভু শ্বেত, কভু লোহিত-বরণী। তাহা দেখিয়া প্রাণপাখী আপনি পুলকে গাহিয়া উঠিত, "কখন কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।" সাদা কথায় পর্য্যায়ক্রমে একদিন ফেনভাত, একদিন চালে দালে ও একদিন গুড়ে চালে, বাল্য যৌবন জরার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই তিন রঙা লপসী প্রতি উষায় আমাদের ভোগের দাসী, এমনি করিয়া আমাদের উদরের চব্বিশ পহরী দুর্ভোগ, এই লপসী সুন্দরী দিয়াই প্রথম আরম্ভ হইল। বেলা নয়টায় সুপারিনঠনঠন ইমার্সন সাহেব রোঁদে আসিলেন, ষ্টেথেস্কোপ বগলে নধরকান্তি ডাক্তার ডয়েলী সাহেবও স্বতন্ত্র দেখা দিয়া, জনে জনের দৈহিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন। দু'চার দিনেই আমরা জেলের কর্ত্তাদের নাড়ী

টিপিয়া বুঝিলাম, ইমার্সন সাহেব লোক মন্দ নহেন, লাল মুখ ও শ্বেত চর্ম্মের মধ্যে প্রাণটি তাঁর বেশ কোমল রাঙা খুড়ো গোছের, আর আইরিশ ডাক্তার ডয়েলী আমাদের স্নেহময়ী পিসিমা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত—যেমন সুরসিক তেমনি দ্যাখনহাসি আবার তেমনি মুক্তহস্ত। শুনা গেল, কয়েদীদিগের অদৃষ্টের লপসী ও জেলভোজ্য কুখাদ্য নাকি ইঁহার এক কলমের খোঁচায়, দুধ রুটি ও কালিয়া পোলোয়া মাছ মাংসে পরিণত হইতে পারে। কেবল একটু ঘুস ঘুসে জ্বর বা কাণের ব্যথা বা পেটের কামড়ানী হইলেই হইল, তাহা হইলে সাত দিনের মত ডাক্তার সাহেবের কৃপায় রোগীর অশেষবিধ উদরনৈতিক উন্নতি অনিবার্য্য।

শুনিয়া প্রাণপক্ষী ধড়ে ফিরিল। যাক্ তবে উপায় আছে, এ হেন সাহারায়ও পান্থ-পাদপ আছে। ভক্তবৎসল, তোমারই মহিমা, পেটে হাত না পড়িলে তোমার অপার করুণা বুঝে কার সাধ্য। সকালে লপসী আহার, দ্বিপ্রহরে জলবৎ-তরলম্ দালের সহিত হরেক রকম পাতাবাহারী মাছের ঝোল দিয়া সকঙ্কর আধ-রাঙা বুক্ড়ি চালের ভাত। ঝোলটি মাছের বলিয়াই বোধ হইল, কারণ গুঁড়া-গাঁড়া মাছ সে পূত জাহ্নবীধারায় সন্তরণ দিয়া স্নান করিতেছিল, তরকারীর অপেক্ষা হরেক রকম পাতাই, এই মৎস্য পাঁচনের আস্বাদ ও রূপের খোলতাই করিয়াছিল। বেলা চারটার সময় দ্বিপ্রহরেরই দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঝে মাঝে একটা তরল টক। কাজেই ডাক্তার ডয়েলীরূপ অধমতারণ বাবা অন্নপূর্ণার শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই এটা বেশ বোঝা গেল। পরদিনই ছেলেরা সুপারিনঠনঠন সাহেবকে আহার বিহারের একটু যথাসাধ্য উনিশ বিশ সম্বন্ধে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল বটে, কিন্তু সাহেব বলিলেন, "তাঁহাকে জেল কোডের পরিধির মাঝে ন্যায় ও করুণাকে লক্ষ্মণ-গণ্ডিবদ্ধা জানকীর দশায় রাখিতে হয়, সুতরাং তিনি নাচার ও নিরুপায়।"

আমরাও বুঝিলাম এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া সদা সত্য কথা

বলিলে বেমালুম পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইতে হইবে, সুতরাং ছেলেদের মুহুর্মুহু ব্যারাম হইতে লাগিল, জ্বর হয় কিন্তু থার্মোমিটারে ওঠে না অথচ রাত্রে ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ঘুমাইলে সময় ও সুবিধা বুঝিয়া হয়। পেটের কামড়, কাণের ব্যথা, মাথা টনটনানি, গা হাত পা কনকনানি, বুক হু হু করা, অনিদ্রা, অস্বস্তি আদি চক্ষুকর্ণের অগোচর যত ব্যাধি হইয়া ঢুকিলে, হৃষীকেশ ডাক্তার সাহেবকে স্পষ্টই বলিল যে, এ ব্যারাম ভাল খাইতে না পাইলে যাইবে না। ডাক্তার পিসিও অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মত প্রকাণ্ড মুখখানিতে দন্তপাটি বিকশিত করিয়া টিকিটে তাহার মাংস ও দুধ লিখিয়া দিলেন। পালাক্রমে আমরা ভূ-স্বর্গরূপ হাসপাতালে মুখ বদলাইয়া আসিতে লাগিলাম।

কয়েক দিন পুলিশ ইন্সপেক্টর, সি. আই. ডি. অফিসারের ঘন ঘন যাতায়াত চলিতে লাগিল। "এটা জান", "ওটা কেমন করে করেছিলে", "মাধাই দাস কে?" ইত্যাদি প্রশ্নের জ্বালায় আমরা মুখখিস্তিও কম করিলাম না। কয়েক দিনের মধ্যেই পুলিশ ব্যাঘ্রের খপ্পরে পড়িয়া কণ্ঠনালী দিয়া তাহার জেলরূপ উদরে ক্রমে ক্রমে কত মানুষই নামিয়া আসিল! নিত্য নূতন নূতন সঙ্গী পাইয়া আমাদের নরক গুলজার হইতে চলিল। আমাদের সঙ্গেই গ্রেপ্তার হইয়াছিল ধরণী ও নগেন কবিরাজ—দুই ভাই; তাহারা বোমার সম্বন্ধে ক অক্ষর গো-মাংস, তবে চোরের সহিত চোরাই মাল রাখিয়া যেমন ধরা পড়ে, তেমনি উল্লাসের দু'একটা চাবি বন্ধ বাক্স রাখিয়া, বেচারীরা আজ পুরস্কার দিতে আসিয়াছে। বাক্সে ব্যাং কি সাপ কি বিছা কিম্বা কি অপূর্ব পদার্থ ছিল, তাহা তাহারা না জানিলে কি হইবে, মানুষের তৈয়ারী কানা আইন তাহা মানিবে কেন? আইনের চক্ষু পুলিশ, হস্ত পুলিশ, লাঠি পুলিশ, তাই তাহার পরিণামে মুড়ি মিছরির এক দর!

মুরারীপুকুর অঞ্চলের কোন এক বাড়ীর দুটি ছেলেও দেখিলাম সেখানে হাজির, বেচারীরা সকালে নাকি বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছায় আমাদের পাপপুরীর সন্নিহিত হইয়াছিল। নীরেট সবজান্তা পুলিশ

গোলার আসামী জ্ঞানে তাহাদিগকেও উদরস্থ করিয়াছে। সে বেচারীরা তো কাঁদিয়াই অস্থির।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে শ্রীহট্টের বীরেন সেন, সুশীল সেন ও হেম সেন, তিন ভাই টানা-জালে গ্রেপ্তার হইয়া দেখা দিল। খুলনা হইতে দুই পাটি দন্ত এক সঙ্গে বাহির করিয়া আসিল সুধীর সরকার, প্রতাপাদিত্যের যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়া আসিল, অরবিন্দের শ্বশুর কুলোদ্ভব বীরেন ঘোষ ও মালদহ হইতে নরেন্দ্র বক্‌সির সহিত বন্ধুত্বের অপরাধে আসিল বাচ্চা কৃষ্ণজীবন। আমাদের স্বীকারোক্তির ফলে, শ্রীরামপুরের নরেন্দ্র গোঁসাই তাহার লঙ্কা প্যাটার্ণ ফতো বাবুর দেহখানি লইয়া পূর্ব্বেই আসিয়াছিল, উপেনের বন্ধু হৃষীকেশ কাঞ্জিলালও ধরা পড়িবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস কাঁপাইয়া জলদগম্ভীর রবে Tom fooleries of Bamfield Fuller ইত্যাদি বক্তৃতা দিয়া নিজের ইহকাল ঝরঝরে করিয়া দেখা দিল। আর একদিন শুভপ্রাতে মত্ত গজরাজবৎ দুলিতে দুলিতে, আমাদের পূর্ব্ববন্ধু দেবব্রত বসু আসিয়া তাঁহার বিশাল শ্রীকলেবর কায়ক্লেশে একটি কুঠরীতে রক্ষা করিলেন। চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার চারুচন্দ্র রায়ও একদিন এই রৌরব নরকস্থ হইয়া তাঁহার ছাত্র উপেন ও কানাই দত্তের সঙ্গ-সুখ লাভ করিলেন। ফ্রেঞ্চ চন্দননগর হইতে যে তাঁহাকে কি করিয়া রাজনৈতিক মোকদ্দমায় ধরা যায়, তাহা তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, ভাবিলাম, হবেও বা, হয় তো যায়, কারণ ফ্রেঞ্চ ও ইঙ্গ চর্ম্ম দুই সমান সাদা এবং পরের ঘাড়ে চড়া, রাজ-শক্তি হিসেবে দুই-ই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। আমরা যখন মুরারীপুকুর বাগানে ঘেরাও হইয়া পুলিশের সহিত অচ্ছেদ্য উদ্বাহবন্ধনে গররাজী হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধ হইতেছি, তখন আমাদের গোপীমোহন দত্তের লেনের আর একটি আড্ডাও ঘেরাও হইয়াছে। সেখানে ছিল শান্তিপুরের নিরাপদ রায় ও চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাহারা আমাদের সহিতই একসঙ্গে ধৃত, বদ্ধ ও

জেলসাৎ হইয়া এ রাক্ষসী বিবাহে আমাদের সপত্নীত্ব সম্বন্ধ লাভ করিয়াছিল।

ধরা পড়িবার পর ক'দিন কুঠরীবদ্ধ ছিলাম মনে নাই, তবে সে কয়দিন যে এক একটি চব্বিশ পহরী বৎসরের আকার ধারণ করিয়া আমাদের বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ হঠাৎ ধরিত্রী ও আকাশ, গাছপালা সব কিছু হইতেই ছিন্ন হইয়া, শুধু শ্যামল মাটির তৃষ্ণা, মুক্ত নীল আকাশের তৃষ্ণা, ফলফুল ডালপালার বিরহই আমাদের কাতর করিয়া তুলিল। আমরা জীবনে অযাচিত যাহা পাই, না হারাইলে তাহার মর্ম্ম, তাহার সুখদ-স্পর্শ বুঝি না, শুধু আপন অজ্ঞাতে তাহা ভোগ করিয়া চলি। তাহার পর সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া ঘরের চারটা দেওয়াল ও তিনদফা পাঁচিলের চাপ, সে যেন রাশি রাশি ইটের স্তূপের পাঁজাবন্দী হইয়া আছি, যেন কংস-কারাগারে দেবকীর বুকে রাক্ষসের পাষাণ-প্রাণে মারিতেছে না, কেবল শ্বাসরোধ করিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণার আস্বাদন জীয়ন্তেই করাইতেছে। তাহার পর হঠাৎ কথা বন্ধ! সে কি যন্ত্রণা। শুধু মনের সুখে আবোল তাবোল বকিয়া যাওয়াই যে এত বড় আনন্দের কারণ তাহা কে জানিত। শুধু কথা না বলিতে পাইলে পেট যে ঢাকাই জালা হয় ও প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্জরে যে কি পরিমাণ ছটফট করে তাহা তখন উপলব্ধি হইতে লাগিল। চুরিচামারি করিয়া পাশের ঘরের সহিত দু'টা কথা বলিতে গেলে আবার প্রহরী চেড়ীর দল "হা হা কর কি, কর কি" রবে ধাওয়া করিয়া আসে। আমাদের মৌনী বাবা হওয়াই নাকি আইন, এই কাষ্ঠ-মৌন ভঙ্গ করিলেই শাস্তি, সে শাস্তি চার দিন ফেন ভাত ও আরও কত দুর্গতি। তাহার পর আমাদেরই মধ্যে কে জানি না প্রহরীদের হস্তে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিবামাত্র এত আইন কানুন হঠাৎ সরল হইয়া গেল, শেষে তাহারাই পাহারা দিত, কোন অফিসার আসে কি না, আর আমরা সলজ্জ নবোঢ়া বধূর মত চাপা গলায় আশে পাশের পিঞ্জরস্থ শুক সারির সহিত দু'টা মনের

আধ মাত্রা অনবধানতাবশে চড়িলেই বার্লির কপিশ চক্ষু আমাদের দিকে দৃকপাত করিতে লাগিল, অমনি আমরা জড়সড় নীরব ভ্যাবাচেকা। দু'চার দিনে কিন্তু ভ্রূভঙ্গিম ঠামে সে বক্র কটাক্ষপাতও সহিয়া আসিল, তখন তাহাতে সানায় না দেখিয়া সাহেব ট্যাড়া ট্যাড়া বাঙলায় ধমকাইতে আরম্ভ করিলেন, মাটিতে বসিয়া থাকিলে, কথা বলার অপরাধে দাঁড় করাইয়া দিতে লাগিলেন।

বিচার বা তদন্ত ও সাক্ষী-সাবুদ কি বলিতেছে তাহা আমরা বড় একটা লক্ষ্য করিতাম না। যাহা হইবার তাহা তো জানা কথা, এখন ঐ সব কচকচির মধ্যে কাঁহাতক থাকা যায়? দিনমানে নিত্য বিচার ও সন্ধ্যার সময় আবার গাড়ীবন্দী হইয়া জেল এবং কুঠরীসাৎ হইয়া নিদ্রা। এইভাবে নিত্য স্নানাহার করিয়া বাহিরে যাওয়াটা যেন একটা আনন্দমেলা হইয়া দাঁড়াইল, মনে হইত, বিচার ও তদন্তই না হয় দু'চার বছর চলুক না, এই বা মন্দ কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সি. আই. ডি বিভাগের গোপন বঁধূরা নিত্য জেলখানায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বুড়া বয়সে কচি মেয়ে বিবাহ করিয়া মানুষের যে দুর্দ্দশা হয়, গরীব মুটে মজুর হঠাৎ সোণার মোহরের কলস পাইলে চোরের ভয়ে ও লোভের উৎপাতে তাহার যে অবস্থা দাঁড়ায়, ইহাদের আজ সেই অবস্থা। সবারই চেষ্টা মধুবর্ষণে মন ভুলাইয়া কথার প্যাঁচে বেসামাল পাইয়া ভুজং-ভাজাং দিয়া কে কোন আসামীর পেটের কথা কটা বাহির করিতে পারে। সকলের মধ্যে ইন্‌স্পেক্টর শ্যামশূল আলমের এ হিসাবে অক্লান্ত অধ্যবসায়। এমন দিন যাইত না যখন শ্যামশূল আলিপুর জেলে চোয়াল্লিশ ডিগ্রির কুঠরীতে কাণা ভোমরার মত গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ না করিতেছে। কালো চাঁপদাড়িশোভন দন্তলবদনে তাহার হাসি লাগিয়াই আছে, কথায় এত মধু, একমাত্র সেই "দিদিশাশুড়ী" রাম-সদয়ের দেখিয়াছিলাম, অজস্র গালি অপমান অকথা কুকথা শুনিয়াও নির্ব্বিকার মিয়াসাহেব তেমনি নাছোড়বান্দা। শেষে কবে জানি না

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল, নরেন্দ্র গোঁসাই, পুলিশ ও তাহার পিতার অনুরোধ উপরোধে ভিজিয়া, রাজার তরফে সাক্ষ্য দিতে রাজী হইল। নরেন্দ্র বড় মানুষের ছেলে, তাহাতে একটু বিশেষ করিয়া বখা, সখের দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল মাত্র। সে আমাদের ভিতরের কথা জানিত না, চন্দননগরের মেয়র তার্দ্দিভেলের উপর বোমা ফেলার সময় কিছু সাহায্য করে এবং বাঁকুড়ায় তাহার জমিদারীর কাছে ডাকাতি করিতে একদলকে একবার সেখানে লইয়া যায়।

আমরা প্রথমে নরেনের ভাবান্তরের কথা জানিতাম না, কিন্তু হঠাৎ তাহার বেশী অনুসন্ধিৎসায় কেহ কেহ সন্দেহ করাতে ব্যাপারটা কাণাঘুসায় রটিয়া গেল। নরেন বুদ্ধিমান ও স্থিরমতি হইলে, তলে তলে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলক্ষণ সর্ব্বনাশটাই বাধাইতে পারিত, কিন্তু কাঁচা চাল দিতে গিয়া যাহাকে তাহাকে যখন তখন গূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া, শীঘ্রই সন্দেহভাজন হইয়া পড়িল। তাহার প্রশ্নগুলাও বড় অদ্ভুত ধরণের, শুনিলেই বুঝা যায় যে, পুলিশের মুখের রচা, সে আবৃত্তি করিতেছে মাত্র; যেমন মাদ্রাজে নেতা কে, মহারাষ্ট্রের নেতা কে? শেষে পণ্ডিত হৃষীকেশ বুদ্ধি ঠাওরাইল যে কতকগুলা রচা নাম তাহাকে বলা যাক; আমরা বৈঠক করিয়া পরামর্শ আঁটিয়া বলিয়া দিলাম, পুণার সভাপতি ছিলেন পুরুষোত্তম নটেকার, মাদ্রাজের ছিলেন বিশ্বম্ভর পিলে; হৃষীকেশও নরেনকে তাহাই শুনাইল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ডাক্তার ডয়েলী ও স্থপারিনঠনঠন ইমার্সন সাহেবের দয়ায় আমরা কুঠরীজাত দশা হইতে উদ্ধার হইয়া তিন নম্বর ওয়ার্ডে দাখিল হইলাম। এ ওয়ার্ডটিতে তিনটি ঘর, দু'পাশে দু'টি ছোট ঘর ও মাঝে একটি বড় হল, সামনে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা উঠান। বড় ঘরে ঢুকিল আড্ডাবাজ ছেলের দল, একদিকের কুঠরী পাইলেন অরবিন্দ ও দেবব্রত এবং অপরদিকের কুঠরী পাইলাম

আমি ও আর ২।১টি ছেলে। প্রথমদিন এইভাবে এক জায়গায় একত্র ছাড়া পাইয়া সে কি উল্লাস, কি হট্টরোল! কিছুক্ষণ ধরিয়া হুড়াহুড়ি, মারামারি, ধস্তাধস্তির পর তবে আসর জমিল। নরেন গোঁসাই এতদিন আলাদা এক কুঠরীতেই ছিল, এখন সকলের সন্দেহভাজন রাগের পাত্র, সেও আসিয়া ৩নং ওয়ার্ডে জুটিল। সেই প্রথম চোট রসিকতার মারামারিটাকে ছল করিয়া, উপেন ও আর কয়জন মিলিয়া তাহাকে একবার মনের সুখে প্রহার দিল। সে তখনি জেলার বাবুর কাছে নালিশ ফরিয়াদ করিয়া জানাইয়া আসিল যে, "এ গুণ্ডার দল আমায় প্রাণে না মারিয়া ছাড়িবে না।" সেইদিনই তাহাকে ভিন্ন করিয়া য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হইল।

এইখানে আসার পর আর এক সুবিধা জুটিয়া গিয়া জেলখানার এই চড়ুইভাতির হট্টগোলে জীবন আরও মধুর হইয়া উঠিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজন বাহির হইতে খাবার ও ফলপাকড় পাঠাইতে লাগিলেন। ৩নং ওয়ার্ডে বোধহয় বেশী দিন থাকি নাই, তাহার পর প্রভাস দে ও পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের সহিত একদল ছেলে ধরা পড়ায়, এখানে স্থান সঙ্কুলান হইবে না ভাবিয়া, ১নং ওয়ার্ডে আমাদের লীলাভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। সেখানি একটি বড় হল, সামনে তার আলিপুর জেলের পাকশালা। এবার ভরা হাট বিপুল আনন্দে ভরিল, প্রায় দিবারাত্র চব্বিশ পহরী হর্‌রা চলিতে লাগিল। কখনও গানের আসর, কখনও লম্ফঝম্ফ, কখনও রঙ্গরস ও প্রভাস দে'কে ক্ষেপানো—ইহার আর বিরাম ছিল না। বাহির হইতে মাছ মাংস ফল মূল এত আসিত যে, খাইয়া ফুরানো দায় হইত; কাঁচা মাছ বা মাংস আসিলে রন্ধনে সিদ্ধহস্ত দ্রৌপদী অংশে অবতীর্ণ, হেম দা' তাহা জেলের উনানে রাঁধিয়া আনিতেন।

প্রতি রবিবারে ও মাঝে মাঝে অন্য দিনও আমাদের আত্মীয়স্বজন জেলে দেখা করিতে আসিতেন। জেলের অফিস ঘরে বাহিরের পাখী আর খাঁচার পাখীর একটা জটলা লাগিয়া যাইত। যে যাহার

আত্মীয়-স্বজন লইয়া ঘরটির এ কোণে সে কোণে স্থানে স্থানে বসিয়া
যাইত আর লোভনীয় খবরের আদান প্রদান করিত। বাহিরটা তখন
দীর্ঘ বিরহের ফলে আমাদের কাছে একটা প্রায় টাটকা রোমান্স হইয়া
দাঁড়াইয়াছে আর জেলরূপ জটেবুড়ীর গোপনপুরী আমাদের আত্ম-
জনের কাছেও একটা ভয়-বিস্ময়-কৌতূহলজনক দুর্জ্জয় রহস্য। জেলের
খুনী, ডাকাত, বাটপাড়, তাহারা কেমন জীব? জেলে মানুষ শোয়
কিসে, খায় কি, দীর্ঘ দিবস রজনী কি লইয়া যাপন করে? তাঁহাদের
কৌতূহলও যেমন অদম্য ও অনন্ত, দুঃখেরও তেমনি অবধি নাই।
আমরা কেবল খুঁজিতাম সংবাদ, সংবাদ আর সংবাদ। বাহিরে দু'চার
জন স্যাঙাৎ প্রাণে বাঁচিয়া গিয়া এখন কি করিতেছে, দেশই বা কি
বলে? সব কি শেষে জুড়াইয়া যাইবে, এতগুলা কাঁচা তাজা প্রাণ
দিয়াও কি দরদের দরদী মিলিবে না?

জেলে যে টাকা দিলে ভাল খাবার পাওয়া যায়, সিগারেট দেশলাই
মেঠাই মণ্ডা লুচি আলুর দম অবধি আর দুর্ল্লভ থাকে না, তাহা জানা
অবধি আমরা কোর্টে গিয়া আত্মীয়-স্বজনের কাছে খবর পাঠাইতাম
টাকার জন্য। এই সময় দেখা করিবার সুযোগে তাঁহারা কেহ কেহ
টাকা আনিতেন এবং চোরের মত এদিকে ওদিকে দেখিতে দেখিতে হাতে
গুজিয়া দিতেন। যদি বা দু' এক জন প্রহরী দৈবাৎ দেখিয়া ফেলিত,
তাহাকে চোখ টিপিলেই সে অমনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া উর্দ্ধমুখে
কার্ণিসের মাকড়সা গণিতে থাকিত। জেলে ফিরিবার সময় কিন্তু খুব
কাছ ঘেঁসিয়া চলিত, তখন ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহার হাতে একটা সিকি
গুঁজিয়া দিলেই সে আর কিছু বলিত না। পাকশালার জবাবদার
(in-charge) জীবটিকে কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়া আমরা আমাদের
ওয়ার্ডের মধ্যে ঘি-মাখা পাতলা রুটি, মাছভাজা ও ডাল তরকারী,
রাত্রের পাহারাওয়ালার (night watchman) হাতে পাইতাম।

যখন ভাটপাড়ার পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় জেলে আটক
হইলেন, তখন সেই নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে লইয়া সুপারিনঠেনঠন

ইমার্সন সাহেবের সাপে ছুঁচো গেলা হইল। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ স্বপাক ছাড়া খাইবেন না, তাহার উপর গঙ্গাজল ছাড়া স্পর্শ করিবেন না। আমরা ভাবিলাম, কলির জেলে গৌরাঙ্গী জেল কোড চাপা পড়িয়া বুঝি ব্রাহ্মণ আহার জল বিনা মারা যায়। কিন্তু ইমার্সন সাহেব একে নির্ব্বিরোধী মানুষ, তায় ব্রাহ্মণ ঠাকুর কয়েদী নন, বিচারাধীন মাত্র। কাজেই অনেকবার আফিসে ডাকাইয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সাহেব ব্যবস্থা করিলেন, তর্করত্ন মহাশয়ের স্বপাকই চলুক, কিন্তু ব্রাহ্মণ আবার জেলের পাকশালায় তাহাদের তৈজস পত্রে রাঁধিবেন না, অগত্যা তাঁহার জন্য জেলের পুকুর পাড়ের গাছতলায় অস্থাবর পাকশালার ব্যবস্থা হইল, অর্থাৎ খান দুই ইটের চুলো আর পিতলা বোগনো। গঙ্গাজল কিন্তু সাহেব কিছুতেই পাশ করিবেন না, তাহা যে ফিল্টার করা নয়, তাহাতে যদি কলেরা বা প্লেগের মাইক্রোব থাকে? শেষে ব্রাহ্মণ ছাতি ফাটিয়া তৃষ্ণায় মরিবে তবু অন্য জল ছুঁইবে না দেখিয়া, সাহেব এটাও মুখ বিকৃত করিয়া গিলিলেন, তর্করত্ন মহাশয়ের একজন জানিত ব্রাহ্মণ এক কলসী জল নিত্য দিয়া যাইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিন রাখিয়া প্রমাণাভাবে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল, নহিলে আলিপুর জেলে সে যাত্রা নিশ্চিত একটা ব্রাহ্মণবধ ঘটিত।

১৪

মোকদ্দমার তদন্ত

আমাদের মোকদ্দমার তদন্ত বার্লি (L. Birley) সাহেবের এজলাসে আরম্ভ হয় ১৯শে মে। ২রা মে ধরা পড়িয়া আমরা জেলে আসি ৪ঠা তারিখে, এবং ১৪ দিন কুঠরীতে পড়িয়া পড়িয়া আপন আপন ভাগ্যপয়োধির লহরী গণিয়া কাটাই। ২রা মে শেষ রাত্রে পুলিশ বেড়া-জালে ঘিরিয়া অনেক স্থানই যুগপৎ তল্লাস করিয়াছিল, তাহার মধ্যে মুরারীপুকুর বাগানে ধরা পড়ি আমরা নিম্নলিখিত ১৪ জন।—

নাম		নিবাস
১। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	—	কলিকাতা।
২। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	চন্দননগর।
৩। উল্লাসকর দত্ত	—	ব্রাহ্মণবেড়িয়া।
৪। ইন্দুভূষণ রায়	—	যশোহর।
৫। বিভূতিভূষণ সরকার	—	শান্তিপুর।
৬। নলিনীকান্ত গুপ্ত	—	রংপুর।
৭। শচীন্দ্রকুমার সেন	—	সোণারং।
৮। বিজয়কুমার নাগ	—	খুলনা।
৯। কুঞ্জলাল সাহা	—	কুষ্টিয়া।
১০। শিশিরকুমার ঘোষ	—	যশোহর।
১১। পরেশচন্দ্র মৌলিক	—	যশোহর।
১২। নরেন্দ্রনাথ বকসী	—	রাজসাহী।

১৩। পূর্ণচন্দ্র সেন — তমলুক।
১৪। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ — যশোহর।

১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্তের লেনে আমাদের যে আর একটা আড্ডা ছিল, এই সঙ্গে সেটাও ঘেরাও হয় এবং চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও শান্তিপুরের নিরাপদ রায় সেখানে সুখ-নিদ্রার কোল হইতে পুলিশের শান্তিময় কোলে আশ্রয় পান। স্টার থিয়েটারের সামনে ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটে অরবিন্দ থাকিতেন, সেই দিন শেষ রাত্রে তিনিও সস্ত্রীক ঘেরাও হন, তবে আমার বৌদিদি ও দিদির ভাগ্যে ছাঁদন দড়ি পড়ে নাই, কারণ তখনও বাঙলার মেয়ে, অন্তঃপুরের গণ্ডী পার হইয়া রাজনীতির রণরঙ্গে ঠিক নামে নাই। বোমার যুগে আমাদের সঙ্গে মেয়েরা দু'চার জন ছিল বটে, পরে জানাজানি হওয়ায় তাহারা তাড়াহুড়াও খাইয়াছিল; কিন্তু প্রাণেও মরে নাই বা রাজার গৃহে অতিথিও হয় নাই। আমার বৌদিদি ও দিদি অবশ্য আমাদের অনুষ্ঠিত কু-কার্য্যের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না; সেজদা' না জানিলেও পার পান নাই, কারণ তিনি 'বন্দে মাতরমে'র কর্ণধার। ঐ ৪৮ নম্বর বাড়ীতে আমরা শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' কাগজখানি নিজেদের তত্ত্বাবধানে বাহির করিবার আয়োজনে সবেমাত্র তখন লাগিয়াছি। 'যুগান্তর' ছাড়িয়া এতদিন পর আবার মনে হইতেছিল কাগজে বলার মত এখনও অনেক কথাই বাকী রহিয়া গিয়াছে। সেই 'নবশক্তির' অনুষ্ঠানের সংশ্রবে আড়বালিয়ার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও তাহারই দেশীয় শৈলেন্দ্রনাথ বসুও গ্রে স্ট্রীটের এই বাড়ীতে ছিল। বলা বাহুল্য অরবিন্দ, অবিনাশ ও শৈলেন্দ্র এখান হইতে সেই রাত্রেই রাজদূত-অঙ্ক আশ্রয় করিলেন।

আমাদের পরম বন্ধু বৃদ্ধ হেমচন্দ্র দাস ওরফে সকলের হেমদা থাকিতেন ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে, তাঁহার মামার বাড়ীতে। সেই সর্ব্বনাশা ২রা মের কাল-নিশায় এই বাড়ীতে তাঁহারও ভাগ্যে কোটাল হস্তে আত্মসমর্পণ ও লালবাজার চালান ঘটে। আগেই

বলিয়াছি চোরাই মাল অর্থাৎ দুই বাক্স সাপ বিছা রাখার দরুণ দুই কবিরাজ ভ্রাতা গ্রেপ্তার হন, সে প্রাতঃস্মরণীয় বাড়ীটির নম্বর ১৩৪ হ্যারিসন রোড। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তস্য ভ্রাতা ধরণীনাথ গুপ্তের আদিম নিবাস মুন্সিগঞ্জ। তাঁহাদের দু'জনের সঙ্গে আরও তিনজনের কপাল সেই রাত্রে ঐ বাড়ীতেই পোড়ে, কালিগঞ্জের অশোকচন্দ্র নন্দী, বর্দ্ধমানের বিজয় রত্ন সেনগুপ্ত ও নড়াইলের মতিলাল রায়। বার্লি সাহেবের দয়ায় নিরপরাধ বিজয় ও মতি অব্যাহতি পান বটে কিন্তু অশোক, নগেন, ধরণী ও উল্লাস আমাদের নরক গুলজার করিতে শেষ অবধি থাকিয়া যায়।

এ ছাড়া ৩০।২ হ্যারিসন রোড, ১১নং হ্যারিসন রোড, ২৩নং স্কটস্ লেন ও উল্লাসকরের পিতা শ্রীদ্বিজদাস দত্তের শিবপুরস্থ বাসায়ও পুলিশ হানা দিয়াছিল। প্রথম বাড়িটি ছিল আমাদের চিঠিপত্র আসিবার গোপন ঠিকানা, এখানে সেই তারিখের কয়েকখানি চিঠি ধরা পড়ে। ১১নং হ্যারিসন রোডে অবিনাশ যুগান্তর পুস্তকালয় খুলিয়া সেখান হইতে "বর্ত্তমান রণনীতি", "মুক্তি কোন পথে", ইত্যাদি বই বিক্রয় করিত বটে কিন্তু পুলিশের শ্রীচরণের পুণ্যরজঃ পড়িবার ২।৩ দিন আগেই এখানকার পাখী নীড় পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, সুতরাং এখানে সজীব নির্জীব কিছুই ধরিবার মত পাওয়া যায় নাই। ২৩নং স্কটস্ লেনে পূর্ব্বে অরবিন্দ থাকিতেন, সেখানেও পুলিশের সুতরাং নিষ্ফল যাত্রা! উল্লাসকরের পিতা তাঁহার পুত্রের অনুষ্ঠিত কুকর্ম্মের কোন সন্ধানই রাখিতেন না, উল্লাসও তাহার পিতৃভবনের সহিত সম্পর্ক একরকম চুকাইয়াই বাগানে আসিয়াছিল। অগত্যা সেখানেও মোকদ্দমার কূলকিনারা মিলিবার মত কিছুই পাওয়া গেল না।

আমাদের কাছে যে সব চিঠি পত্র কাগজাদি পাওয়া গিয়াছিল তাহার দরুণ এবং পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে পরে ক্রমশঃ ধরা পড়ে শ্রীরামপুরের হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনার সুধীরকুমার সরকার, সাগরদাঁড়ি যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল,

সিলেটের তিন ভ্রাতা হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও সুশীলচন্দ্র সেন এবং শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

তদন্ত চলিতে চলিতে নূতন নূতন মূষিক ধরারও বিরাম ছিল না, এই সব পরবর্ত্তী গ্রেপ্তারী আসামী লইয়া আলিপুর মামলার দ্বিতীয় দল গঠিত হয়। তাহার মধ্যে আরও পড়িয়াছিলেন দেবব্রত বসু, চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার চারুচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রভাসচন্দ্র দেব, আমার মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নাগপুরের বালকৃষ্ণ হরি কাণে এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী।

দেবব্রত পূর্ব্বে আদিপর্ব্বে কেবল বিপ্লবতন্ত্র প্রচারেরই যুগে আমাদের সঙ্গের সাথী ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং সাধনজীবন তাহার জীবনের সকল কিছু ভরিয়া ফেলায়, সে আমাদের দানবে কাণ্ডের চণ্ডলীলায় থাকে নাই। তবু এ কুসঙ্গ একবার করিয়া কাহারও নিস্তার নাই, তা আদি পর্ব্বেই করুক আর বিরাট পর্ব্বেই করুক। তাহার সাক্ষী দেবব্রত, চারুবাবু, বিজয় ও নিরালম্ব স্বামী। চারুবাবুর অপরাধ তিনি উপেন্দ্র ও কানাইয়ের কলেজ-জীবনের মাষ্টার মশাই, তাহার উপর দুইজনকেই তখনও স্নেহ করিতেন ও বাটীতে ডাকিয়া সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। ভবানীপুরস্থ রাণী শঙ্করী লেনের বিজয় ভট্টাচার্য্যের অপরাধ, সে তাহার বাড়ী আমাদের ভাড়া দিয়াছিল, বেচারী জানিত না, সাক্ষাৎ চণ্ডীর দানাদৈত্যদের বাড়ী ভাড়া দিয়া, খাল কাটিয়া গাঙ্গের কুমীর ঘরে আনিতেছে। নিরালম্ব স্বামী যখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন তিনি আমাদের বিপ্লবের প্রথম কর্ম্মী নেতা, সে একেবারে গোড়ার কথা। কি করিয়া যতীনদা ও আমি বাঙ্গলায় প্রথম বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপনা করি, পরে কি করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ হয় এবং কিছুদিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করিয়া মিলনের পর পুনর্বিরোধে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এ সব কথা আমার "বোমার কথা"য় বলিব। আমরা ধরা পড়িবার বহু পূর্ব্বেই তিনি

বিপ্লব সমিতি হইতে বিদায় লইয়া এ হিসাবে নিষ্কর্ম্মা হইয়াছেন। তবু ইহাদের সকলকেই অতীত পাপ খণ্ডাইবার জন্য গ্রেপ্তার ও জেলভোগ করিতে হইয়াছিল, বিচারে অবশ্য সবাই খালাস পান; চারুবাবুর মোকদ্দমা সরকার বাহাদুর স্বয়ং তুলিয়া লন। তিনি ফরাসী রাজ্য চন্দননগরের বাসিন্দা, রাজনৈতিক অপরাধে তাঁহাকে সেখান হইতে ধরা অসম্ভব সত্ত্বেও, পুলিশ ও ফরাসী মেয়র জুটিয়া তাঁহাকে বে-আইনী গ্রেপ্তার করাইয়াছিল। শেষে গণ্ডগোল বাধে দেখিয়া এত কষ্টে উদরস্থ মূষিকও উগরাইতে হইল।

১৯শে মে হইতে বার্লি সাহেব ১১ই সেপ্টেম্বর অবধি তদন্ত চালাইয়া ৩৮ জনকে সেসন্স্ সোপর্দ্দ করেন। সেই অবসরে নিত্য জেল ও আদালত করিয়া করিয়া আমরা খানিকটা বাহিরের বাতাস পেট ভরিয়া খাইয়া লই। প্রতিদিন তাড়াতাড়ি জেলের ভাত গিলিয়া আদালতে যাওয়াটাই ছিল আমাদের স্কুলের ছুটি, এবং সন্ধ্যায় জেলে ফেরাই ছিল যমদূত মাষ্টারের কবলস্থ হওয়া। প্রকাণ্ড বেথুন কলেজের গাড়ীর মত বন্ধ পর্দ্দানসিন গাড়ীতে চড়িয়া

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞানে।"

গান গাহিতে গাহিতে যাত্রা করা ছিল একটা বিরাট উৎসব। মোকদ্দমার সাক্ষী সাবুদ সওয়াল জবাবটা ছিল নিছক মায়া; পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, সামলা, গাউন একটা প্রহসন। সকলেরই মনের ভাব যেন "কেন আর কিসের মায়া, কাঞ্চন কায়া তো রবে না।" আমরা মনে মনে মরিয়া ভূত হইয়া নির্লিপ্ত আনন্দে মজা দেখিতেছিলাম। এই কমেডি বা সুখের নাটকের তলে তলে একটা ট্রাজেডিও জমা হইতেছিল, তাহা বার্লির কোর্টের তদন্ত শেষ হইবার পরেই, হঠাৎ সব হাসি তামাসা আতস রোশনাই, এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, আমাদের বন্ধনের স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নৃসিংহবৎ বাহির হইল। জেল-খানায় নরেন্দ্র গোঁসাই রাজার সাক্ষী মারা পড়িল।

... যে পরিমাণে বেশী, মাত্রাজ্ঞান সেই পরিমাণে কম। এই রকম পরিণাম-কাণা দুঃসাহসী মানুষেই, জগতে এ সব অসম্ভব কাজ করিয়া থাকে ; চেষ্টা সফল হইলেই তবে লোকে স্বীকার করে "হাঁ, হয় বটে", কিন্তু গোড়ায় শুনিলে পাগলের পাগলামি বলিয়াই উড়াইয়া দেয়। এখন জীবনের বহুদর্শিতায় আমরা অনেক সজ্ঞান ও অনেক ধাতস্থ, কিন্তু এখনও আমার মনে হয় সেকালের বন্দোবস্তে আলিপুর জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। তখন জেলার ছিলেন চতুর্থপক্ষের স্ত্রীর আঁচলের মণি যোগেনবাবু ; তিনি বৃদ্ধ ও স্থূলকায়, পটু জেলার হইলেও সেকালের বাঙালীর মতই বীর। তাঁহার চরানুচরের মধ্যে ছিল ভোজপুরী জেল পুলিশের দল, একজন চার বিল্লা (Four striped) হেড জমাদার, একজন তিন বিল্লা (Three striped) ছোট জমাদার ও কচি কচি বাঙালী নায়েব জেলার কয়টি।

মাথায় আমার খেয়াল ঢুকিবামাত্রই পত্রপাঠ যোগাড়যন্ত্রে লাগিয়া গেলাম। কোর্টে যাইতাম আসিতাম ও সেখানে কয়েকজন বন্ধুর সহিত যোগাযোগে বন্দোবস্ত করিতাম। টাকার ব্যবস্থা হইল, অস্ত্র সংগ্রহ চলিতে লাগিল বাহিরে বাহিরে ; স্থির হইল, ১০।১২টি রিভলবার বাহিরে সংগ্রহ করিয়া জেলের মধ্যে একে একে আনানো

রাজনীতিক অপরাধী
জেলের মানুষটিকে রাজী করান হইল। শুভকার্যের রাত্রে সে
যোগাড়যন্ত্র করিয়া আপন মনের মানুষ দু'চার জনকে পাহারায়
রাখাইবে, আমরা মোম আনাইয়া ব্যারাকের চাবির ছাঁচ লইবার
চেষ্টায় রহিলাম। আত্মীয়-স্বজনের সহিত অনেক বন্ধু-বান্ধবও দেখা
করিতে আসিত, সেই দেখার অছিলায় একে একে পিস্তল জেলের
মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্যারাকে শুইবার জন্য মাটি ও ইট
দিয়ে উঁচু করিয়া গড়া খাটের মত শান বাঁধানো ছিল, তাহার ইট দুই-
একটা কৌশলে খসাইয়া আমরা পিস্তল রাখিবার খোপ করিয়া
লইলাম। তাহার আগেই ২টা পিস্তল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই
সময় ছেলেদের মধ্যে অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল যে, কি করিয়া
নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে ইহধাম হইতে সরান যায়। আমার পরামর্শ
চাহিলে আমি সে চেষ্টা জেলের বাহিরে করাইবার কথায় জোর
দিয়াছিলাম, কারণ জেলে করিলে আমার এত সাধের পগার
ডিঙাইবার চক্রান্তটি পণ্ড হয়। আমি জানিতাম না যে, ছেলেদের
একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে
জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে। তখন নরেন সত্য-
মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অনেক নিরীহ মানুষকে ফাঁসাইতেছে, তাহার

১৫

জেলভাঙার চক্রান্ত

বার্লি সাহেবের কোর্টে মোকদ্দমা থাকিতে থাকিতেই আমার খেয়াল ঢোকে যে, জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে হইবে। তখন ধাতে রোমান্স ও মরিয়া সাহস যে পরিমাণে বেশী, মাত্রাজ্ঞান সেই পরিমাণে কম। এই রকম পরিণাম-কাণা দুঃসাহসী মানুষেই, জগতে এ সব অসম্ভব কাজ করিয়া থাকে ; চেষ্টা সফল হইলেই তবে লোকে স্বীকার করে "হাঁ, হয় বটে", কিন্তু গোড়ায় শুনিলে পাগলের পাগলামি বলিয়াই উড়াইয়া দেয়। এখন জীবনের বহুদর্শিতায় আমরা অনেক সজ্ঞান ও অনেক ধাতস্থ, কিন্তু এখনও আমার মনে হয় সেকালের বন্দোবস্তে আলিপুর জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। তখন জেলার ছিলেন চতুর্থপক্ষের স্ত্রীর আঁচলের মণি যোগেনবাবু ; তিনি বৃদ্ধ ও স্থূলকায়, পটু জেলার হইলেও সেকালের বাঙালীর মতই বীর। তাঁহার চরানুচরের মধ্যে ছিল ভোজপুরী জেল পুলিশের দল, একজন চার বিল্লা (Four striped) হেড জমাদার, একজন তিন বিল্লা (Three striped) ছোট জমাদার ও কচি কচি বাঙালী নায়েব জেলার কয়টি।

মাথায় আমার খেয়াল ঢুকিবামাত্রই পত্রপাঠ যোগাড়যন্ত্রে লাগিয়া গেলাম। কোর্টে যাইতাম আসিতাম ও সেখানে কয়েকজন বন্ধুর সহিত যোগাযোগে বন্দোবস্ত করিতাম। টাকার ব্যবস্থা হইল, অস্ত্র সংগ্রহ চলিতে লাগিল বাহিরে বাহিরে ; স্থির হইল, ১০।১২টি রিভলবার বাহিরে সংগ্রহ করিয়া জেলের মধ্যে একে একে আনানো

হইবে, তাহার পর কোন জেলের লোককে কোন রকমে উৎকোচে বা কৌশলে বশীভূত করিয়া রাত্রে ব্যারাকের চোরা চাবির সাহায্যে বা রেলিং কাটিয়া আমরা বাহির হইব। সামনে পাকশালা, তাহার পর পাইখানা, তাহার পরই জেলের প্রাচীর। বাহিরে মোটরগাড়ী হাজির থাকিবে, তাহাতে চড়িয়া আমরা ছোটনাগপুরের বিন্ধ্য ও কাইমুর গিরিমালার উদ্দেশে যাত্রা করিব। একটা ধোঁয়াটে রকম ধারণা ছিল যে, বিন্ধ্যশ্রেণী ধরিয়া রাজপুতানা হইয়া ভারত হইতে আবশ্যকমত চম্পট পরিপাটিও দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের উত্তরে কাবুল কান্দাহার আর পশ্চিমে পারশ্য, ইংরাজের এলাকার বাহিরে রাজনীতিক অপরাধী গ্রেপ্তার করা আন্তর্জাতিক আইনে চলে না।

জেলের মানুষটিকে রাজী করান হইল। শুভকার্যের রাত্রে সে যোগাড়যন্ত্র করিয়া আপন মনের মানুষ দু'চার জনকে পাহারায় রাখাইবে, আমরা মোম আনাইয়া ব্যারাকের চাবির ছাঁচ লইবার চেষ্টায় রহিলাম। আত্মীয়-স্বজনের সহিত অনেক বন্ধু-বান্ধবও দেখা করিতে আসিত, সেই দেখার অছিলায় একে একে পিস্তল জেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্যারাকে শুইবার জন্য মাটি ও ইট দিয়ে উঁচু করিয়া গড়া খাটের মত শান বাঁধানো ছিল, তাহার ইট দুই-একটা কৌশলে খসাইয়া আমরা পিস্তল রাখিবার খোপ করিয়া লইলাম। তাহার আগেই ২টা পিস্তল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময় ছেলেদের মধ্যে অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল যে, কি করিয়া নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে ইহধাম হইতে সরান যায়। আমার পরামর্শ চাহিলে আমি সে চেষ্টা জেলের বাহিরে করাইবার কথায় জোর দিয়াছিলাম, কারণ জেলে করিলে আমার এত সাধের পগার ডিঙাইবার চক্রান্তটি পণ্ড হয়। আমি জানিতাম না যে, ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে। তখন নরেন সত্য-মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অনেক নিরীহ মানুষকে ফাঁসাইতেছে, তাহার

এজাহারে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রংপুর আদি অনেক স্থানে বহু লোক এমনকি স্থানে স্থানে রাজা জমিদার অবধি ধরা পড়িতেছে। নরেন মরিলে এতগুলি মোকদ্দমা বেমালুম ফাঁসিয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে মোকদ্দমা সেসন্সে সোপর্দ্দ হইবার পূর্ব্বেই এ কাজ কিন্তু করা দরকার। তদন্তে সে যাহা বলিতেছে তাহা সেসন্সে বলিতে পাইলে এবং তাহার সাক্ষ্য আর কেহ প্রমাণ করিলে (coroborate) মোকদ্দমাগুলি কায়েম হইয়া দাঁড়াইবে। আমি মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিলাম যে, বাহির হইতেই কেহ না কেহ এ কার্য্য নিশ্চয়ই করিবে, আমাদের মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। আমি মাথা গুঁজিয়া আপন মনে আপন তালেই চলিতেছিলাম, কে কি পরামর্শ আঁটিতেছে কিম্বা কি করিতেছে সে দিকে বড় একটা নজর দিই নাই। কাঁচা লিডারের যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদনুরূপই ছিল, বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও autocratic গোছের; সবাইকে লইয়া কাজ করিতাম বটে, কিন্তু আপন গোঁয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া ছেলেদের কাহারও কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের ভাব যে দেখা দিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিলাম, বিশেষ কিছু কাজ না করিয়াই ধরা পড়িয়া গেলাম, এই আক্ষেপই এই অভিমানের কারণ। জেলের প্রথম কতক দিন নিজের আশার শ্মশান লইয়াই গুম হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার পর দেবব্রতের স্পর্শে আমার এতদিনের মুলতুবি রাখা সাধনাও অল্পে অল্পে জীবন পাইতেছিল। তাই ছেলেদের এ রাগ আমি দেখিয়াও দেখি নাই, এটা ভাবিয়া উঠিতেও পারি নাই যে, আমাকে বাদ দিয়া অন্ততঃ আমাকে না জানাইয়া, তাহারা একটা কিছু করিবে। আমার মনোভাব জানিয়া তাহারাও তাহাদের কৃতসংকল্পতার কথা আমাকে বিন্দু-বিসর্গও বলে নাই, শুধু একবার, কথায় কথায় মতটা জানিয়া লইয়াছিল।

১৬

কানাই ও সত্যেনের চরিত্র

আমি যাহা ভাবি নাই, ঘটিল তাহাই। এই অসন্তুষ্ট দলের কয়েকজন গোপনে পরামর্শ করিয়া সব স্থির করিল। আমাকে জানানো হইল না, কারণ তাহারা ধ্রুব জানিত, আমি জানিলে বাধা দিব, জেলের ভিতর এ কাণ্ড কিছুতেই করিতে দিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাইবার লোভে ছেলেরা প্রায়ই হাসপাতালে যাইত। আমার মামা সত্যেন্দ্র হাঁপানী রুগী বলিয়া হাসপাতালে পাকা-পাকিই এক রকম থাকিয়া গিয়াছিল। সত্যেন্দ্র আমার দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ সহোদর অভয় বাবুর সেজ ছেলে; সে আমাদের মেদিনীপুর শাখার কর্ণধার ছিল। এই পরিবারে হাঁপানী বংশগত ব্যাধি, সত্যেনের এক বোনের আছে, তার কন্যার আছে, সত্যেনেরও ছিল। মাঝে মাঝে শ্বাস উঠিয়া সে বড় কষ্ট পাইত, যখন ভাল থাকিত, তখন রোগা ছিপছিপে সত্যেন কিন্তু সবার অধিক খাটিত। মেদিনীপুরে বাঙলার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সেই প্রথম নরম ও গরম দলের বিরোধের সূত্রপাত হয়; সমস্ত জেলায় খাটিয়া প্রতিনিধি জড় করা ও ভলাণ্টিয়ার দল সাজানোয় সত্যেনের অনেকখানি হাত ছিল। সে তলে তলে আমাদের কাজ করিত, আর প্রকাশ্যে গরম দলের কাজও গুছাইয়া দিত। অনেক বিলাতী চিনি ও নুন ফেলা ও কাপড় পোড়ানোর সে ছিল পাণ্ডা। একবার ক্ষুদিরাম প্রভৃতি ছেলেরা গুপ্ত প্যাম্‌ফ্লেট বিতরণ করিয়া পুলিশের সহিত সংঘর্ষ বাধায়। তাহারও চাঁই সত্যেন; নিরাপদ রায় এই মেদিনীপুর শাখার ছেলে।

আমি যেবার প্রথম মেদিনীপুর গুপ্ত-সমিতি পরিদর্শন করিতে যাই সেবারকার কথা আজও মনে আছে। দেখিলাম পাঁচ দশ টাকা ভাড়ার একটি ছোট অন্ধকার বাড়ী, মাঝে বোধহয় দুইটি ঘর। একটি ঘরে এক পাশে মাটির জিভ বার করা মা কালী ধূলা মাখিয়া দাঁড়াইয়া সন্তানদের কাণ্ড চক্ষু পাকাইয়া পাকাইয়া দেখিতেছেন। কবে কে জানে মা এই দুর্দ্দান্ত সন্তানদের কাছে পূজা পাইয়াছিলেন, তাহার সিঁদুর নৈবেদ্য শুষ্ক ফুল এখনও সামনে পড়িয়া আছে। তাহারই এ পাশে ছেঁড়া মাদুরে ময়লা বিছানায় দু' তিন জন ছেলে রাত্রে শোয়। ভিতর দিকে একটু ফাঁকা উঠানের মত, তাহাতে পাতকুয়া। ছেলেরা আপনি রাঁধে, বাড়ীর সব কাজ আপনারাই করে; চাকর-বাকর নাই। বিপ্লব কেন্দ্রে চাকর রাখিবে কাহাকে? তাহাকে অবলম্বন করিয়া শনি ঢুকিতে কতক্ষণ? এই সমিতির "আনন্দ মঠ" না অমনি একটা রোমান্টিক নাম ছিল; সত্যেন কাছেই নিজের বাসায় থাকিত, এখানে কাজে কর্ম্মে আসিত। সত্যেন ছিল খুব মেধাবী বুদ্ধিমান ছেলে, বই ও খবরের কাগজ পড়া ছিল তার একটা রোগের মধ্যে। যখন আমরা সার্কুলার রোডে য-দার সহিত প্রথম কাজে নামি, তখন কিছু দিনের জন্য সত্যেনও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিল। শেষে আত্মকলহে কেন্দ্রটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মেদিনীপুরে চলিয়া যায়। আলিপুর জেলে এই অসমসাহসিক কাজ করিবার আগে কখনও কখনও সে বলিত, "রোগের জ্বালা আর সইতে পারি নে, কোন এক পাপিষ্ঠকে মেরে একদিন মরে বাঁচবো।"

কানাই আমাদের মধ্যে আসে আমরা চাঁপাতলার 'যুগান্তর' আফিসে থাকিতে; কিন্তু তখন সে রুগ্ন, ম্যালেরিয়ায় বড় ভুগিতেছিল। তাই আমরা শরীর সুস্থ করিবার জন্য তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে পুরী পাঠাই। কানাই ছিল রোগা, ঢ্যাঙা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আয়ত চক্ষু ও ধীর।

আমরা সবাই ছিলাম অল্প বিস্তর বাচাল এক কানাই বাদে, সেই ছিল আমাদের মধ্যে নীরব মৌন মানুষ, অ-দরকারে সে বড় একটা কথা কহিত না। ক্রমাগতই সে আমার কাছে একটা প্রাণমন ভরা কাজ চাইত, আমি তখন সবে বাগানে আড্ডা ফাঁদিবার সংকল্পে আছি, হঠাৎ ফর্মাস-মাফিক কাজ তখন দিই কোথা হইতে! মানুষটিও নিতান্ত জরাজীর্ণ, নিত্যই একবার করিয়া সেই বাঙ্গালীর দোসর ম্যালেরিয়া অসুরের কবলস্থ হয়। তাই আমরা তাহাকে আগে শরীরটা সুস্থ করিবার বরাত দিয়া পুরী পাঠাইলাম, সেও নিমরাজী হইয়া অপ্রসন্নচিত্তে চলিয়া গেল। পুরী হইতে আসিয়া সে সবে গোয়াবাগানের বাসায় ছিল, মনের মত কাজ তখনও পায় নাই। তখন সেও জানিত না এবং আমিও জানিতাম না যে, তাহার মনের মত কাজ সে পাইবে, কারাগারে সহস্র বন্ধনের মাঝে, এবং সে-কাজ করিয়া তাহার আর মানুষের সংসারে স্থান হইবে না। জেলে আসিয়া তাহার মন ভাঙিয়া গিয়া এক রকম আগে হইতেই জীবনে ইস্তফা দিয়াই সে বলিয়াছিল, "বিশ বছর জেল আর যেই খাটুক আমি খাটছি নে, তার অনেক আগেই নিজের ছুটি করে নেব।"

কানাইলাল কি ধাতুর তৈরী বস্তু তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝি নাই। সে আমাদের মধ্যে নূতন কর্ম্মী, তখনও তাহার কোন পরীক্ষাই হয় নাই; নূতন মানুষ কাজের কাজী না হওয়া অবধি আমাদের কাছে আমলেই আসিত না। শেষে যখন সে বিপদের কালবৈশাখীর দিনে আপন শক্তি-পরীক্ষা আপনি দিল, তখন তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; আমরা যক্ষপুরীর মাঝে জীবনের আঁধার নিশায় তাহাকে চিনিলাম শুধু হারাইতে। সে ছিল সেই ধাতুর গড়া মহাপ্রাণ বীর, যাহারা স্বভাববশে পরের জন্য অযাচিত হইয়া জীবন দেয়, সে ছিল ভারতের চতুর্ব্বর্ণের মাঝে ভগবানের গড়া ক্ষত্রিয়।

দেশে ইংরাজ-শাসন না থাকিলেও সে তবু ক্ষত্রিয়ই হইত, আর কোন অধর্ম্মের বিরুদ্ধে জীবন দিয়া স্বধর্ম্ম রাখিত।

১৭

কানাইয়ের কীর্তি

মনে আছে, সে দিনকার প্রভাতটি ছিল শ্বেত শতদলের মত তেমনি শুভ্র, তেমনি প্রসন্ন। এই সময় সকালে স্নানের পর বেলা আটটায় আমি সাধনায় বসিতাম। জীবনের ক্ষীরস্রোতা ও কামনার পঙ্ক-বাহিনী তখন একসঙ্গেই বহিতেছিল, দুই ধারা মিলিয়া কখন যে উজানে বহিবে ভাগবতমুখী হইয়া, সে ধারণাও তখন বড় অস্পষ্ট। নিশ্চিন্ত মনে আমি স্নান করিতেছিলাম। ধরণীর উষামুগ্ধ সে শান্ত উজ্জ্বল তপনশ্রী ছবি দেখিয়া কে বলিবে যে প্রকৃতির বুকে তখনই অমন অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন হইয়া রহিয়াছে? সব দেখিয়া দেখিয়া বোধ হয় এ যেন দুটি জগৎ, প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত নির্লিপ্ত অকাম লীলা এক-দিকে, আর মানুষের কামনার দ্বন্দ্ব-দ্বেষের গড়া মানস জগৎ আর এক-দিকে ; এ দুটির কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে না, অথচ দুইটিই পাশাপাশি চলে। একটি যেন শান্ত শীতল পট আর একটি চঞ্চল জীবন্ত ছবি, একটি কোলে করিয়া আর একটিকে ফুটায়।

হঠাৎ একটা ছুটাছুটি হট্টগোল পড়িয়া গেল। আমি স্নানের পৈঠার উপর দাঁড়াইয়া দেখিলাম, হাসপাতালের দিকে মানুষ দৌড়াইতেছে, কাছে চাহিয়া দেখিলাম স্নান-রত —র মুখে স্মিত হাসি, উদ্বেগের কৌতূহলের চিহ্ন মাত্র নাই, কেমন একটু সঙ্কোচ ও কৌতুক লইয়া সে আপন মনে স্নানই করিতেছে। তখন আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি ব্যারাকে ঢুকিলাম, প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

প্রথমটা একটা আতঙ্কের হৈ হৈ রৈ রৈ, তাহার পর খানিকটা সব চুপ! তাহার পর পাগলা ঘন্টি Alarm Bell বাজিয়া উঠিল এবং খাকীপরা বন্দুকধারী পুলিশ কাতারে কাতারে জেল ফটক দিয়া ঢুকিতে লাগিল। এই সময় পূর্ব্বদিকের পুষ্করিণীর পাড় হইতে একজন বুড়া কয়েদী ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার স্বরে বলিল, "বাবুজী, গোঁসাই ঠাণ্ডা হো গিয়া।" প্রায় দশ পনের মিনিটের পর দেখা গেল সত্যেন্দ্র ও কানাইলালকে ঘিরিয়া পুলিশের দল ফটকের দিতে আসিতেছে। কানাই হাসিতে হাসিতে দৃঢ় পদে চলিতেছে। তাহার পর পুলিশের দল সারি সারি আসিয়া কাতারবন্দী হইয়া আমাদের ওয়ার্ডের সম্মুখে দাঁড়াইল, শেষে সুপারিনঠেন্ঠেন্ ইমার্সন সাহেব সহ জেলার, নায়েব জেলার আসিয়া ওয়ার্ডের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। এতক্ষণে আমরা কাগজপত্র ও বে-আইনী মাল মসলা যথাসাধ্য নষ্ট করিয়া ইতস্ততঃ ফেলিয়া দিয়া ভাল মানুষ সাজিয়া বসিয়া আছি! ইমার্সন সাহেব আমাদিগকে বাহিরে লইয়া সারবন্দী করিয়া বসাইয়া ব্যারাক তল্লাসী করিলেন, তাহার পর একে একে আমাদের কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া, আমাদিগকে পুনঃ ব্যারাকবন্দী করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্যারাকে কিছুই পাওয়া গেল না। ১৫।১৬টা টাকা কার্ণিশের উপর তোলা ছিল, তাহা তল্লাসকারী প্রহরীই যথাশাস্ত্র নীরবে ট্যাকস্থ করিল।

ব্যাপারটা যাহা হইয়াছিল তাহা শুনিলাম পরে। সত্যেন ও কানাই হাসপাতালে কায়েম হওয়া অবধি নরেনকে বার বার বলিয়া পাঠাইতেছিল যে, তাহারাও রাজার সাক্ষী সাজিতে রাজী আছে। নরেন যদি আসিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তিনজনেই এক-বাক্যে একই প্রমাণ দিতে পারে। রাজার সাক্ষী হইলেই হয় না, অন্য কাহারও কথায় তাহার বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ (coroboration) হওয়া চাই। নরেন বিলক্ষণ জানিত তাহার একার কথায় জোর বাধিতেছে না, এই coroborative evidences-এর অভাবে। তাই দু'চার দিন ডাক শুনিয়া শুনিয়া লোভ সামলাইতে

না পারিয়া, একদিন সে হাসপাতালে আসিয়া হাজির হইল। সে তখন য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডে দুই একজন য়ুরেশিয়ান কয়েদীর হেফাজতে ছিল। সেদিন সকালে তাহাদেরই একজন নরেনের সঙ্গে হাসপাতালে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র সত্যেন তাহাকে লইয়া যত্ন করিয়া আপনার শয্যায় বসাইল। বাহিরের বারান্দায় কানাই একটি রিভলবার পকেটে পায়চারী করিতেছিল, যদি কোন গতিকে শিকার ফস্কাইয়া পালায়, তাহারই জন্য পথে এই ঘাঁটি আগলানো। সত্যেনের সহিত কথা হইতে হইতে হঠাৎ কম্পাউণ্ডার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা না অমনি কি কাজে কানাইকে ডাকিয়া লইয়া গেল। কানাইও গেল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আসিবে আশায়। এদিকে সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে পকেটেই পিস্তল সই করিয়া লইয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। গুলি নরেনের উরুতে লাগিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। য়ুরেশিয়ান কয়েদী সত্যেনকে ধরিতে গিয়া পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া পিছাইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ছিল কুস্তিগীর, বেশ সাজোয়ান পুরুষ; গুলি খাইয়া সে হাসপাতাল ছাড়িয়া বাহির হইয়া দৌড় দিল।

কানাই হট্টগোল শুনিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিল শিকার পলাইয়াছে। সে হাসপাতাল গেটে আসিয়া পিস্তল উঁচাইয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন কোন্ দিকে গেল?" সে বেচারী প্রাণের দায়ে অঙ্গুলী সঙ্কেতে সে দিকটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর পশ্চাদ্ধাবন। এই সময় জেলার, নায়েব জেলার, বড় জমাদার সদলবলে রোঁদে আসিতেছিলেন, তাঁহারা রক্তাক্তপদে মুক্তকচ্ছ অবস্থায় নরেনকে দৌড়াইতে দেখিয়া তাহাকে থামাইয়া ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। আতঙ্কে নরেন কিছু বলিতে পারিল না, শুধু পিছনে হস্ত সঙ্কেতে দেখাইয়া কোন গতিকে বলিল, "ঐ আসছে, আমায় ছেড়ে দেও।" বলিতে বলিতে কানাই পিস্তল

হস্তে অদূরে দেখা দিল। তখন কোথায় গেল জেলার, কোথায় গেল বড় জমাদার, যে যেদিকে পারিল উভরড়ে ছুটিল ; বড় জমাদার পড়িয়া গিয়া বর্ত্তুলের মত গড়াইতে গড়াইতে নর্দ্দমায় গা ঢাকা দিল। খোলসা পথ পাইয়া কানাই তাড়া করিতে করিতে নরেনের পিঠ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, গুলি শির-দাঁড়া ভেদ করিয়া বুকে বসিয়া গেল, ফলে নরেন তখনই মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

বাহিরে থাকিতে অনেকবার অনেক জায়গায় বোমা ফেলিয়াও আমরা শিকার পাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই, মৃত্যু প্রায়ই সে ব্যক্তির রগ ঘেঁসিয়া গিয়া কোন গতিকে আক্রান্ত ব্যক্তি বাঁচিয়া গিয়াছে। বোমা বস্তুটাই বেজায় অনিশ্চিত কাণ্ড, ফাটিলে কাহাকে যে মারিবে আর কাহাকে রাখিবে তাহা বলা দুষ্কর। হয়তো কাছের মানুষ বাঁচিয়া গেল, দূরের আশে পাশের মানুষ পড়িল আর মরিল ; হয়তো খানিকটা আতসবাজী হইয়া গেল, পিঁপড়াটিও মরিল না। এইজন্য আমাদের মধ্যে রগ ঘেঁসিয়া ফাঁসিয়া যাওয়া—narrow escape একটা আখড়াই বিদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নরেন-গোঁসাই-বধ-মহাকাব্য হইয়া চুকিলে, আমরা কানাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, "তুমি একটা গুলি নিজের জন্য রাখিলে না কেন?" কানাই তাহার উত্তরে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, "আমরা যাহাই করি তাহাই narrow escape হইয়া ব্যর্থ হয়, তাই যতগুলি গুলি পিস্তলে ছিল, সব একে একে নরেনের শরীরেই চালাইয়াছি, কি জানি যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে বাঁচিয়া উঠে। আমি নিজে নিজের হাতে আত্মঘাতী হই নাই, কারণ, সাধ ছিল একবার নিজের মুখে বলিয়া মরিব যে, যাহা করিয়াছি তাহা দেশের খাতিরে করিয়াছি। I shall give the deed its true character, যাহা করিলাম, তাহার মর্য্যাদা আমাকেই রাখিতে হইবে।"

নরেনকে মারিয়া কানাই পলায় নাই, খালি পিস্তল হাতে হাস্য-মুখে দাঁড়াইয়াছিল। পুলিশ আসিলে পিস্তল ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায়

ধরা দিল। পুলিশ এবং পরে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি জেলের মাঝে পিস্তল কোথা পাইলে?" কানাই উত্তরে বলিয়াছিল "ক্ষুদিরামের ভূত আমায় পিস্তল দিয়া গিয়াছে।"

কানাইকে বিচার করিয়া সেসন্স সোপর্দ্দ করা, সেসন্সের বিচার সবই হইল আলিপুর জেলের গণ্ডীর মাঝে—কি জানি ক্ষুদিরামের ভূত যদি আবার মালমসলা যোগাইয়া এ সর্ব্বনাশা মানুষকে পুনশ্চ কোন কুকার্য্যে রত করে। চোয়াল্লিশ ডিগ্রির একটি ঘরে কানাই ও আর একটি ঘরে সত্যেন বন্ধ রহিয়া, আইনের মারপেঁচে জীবনের গোণা দিন কয়টি অতিবাহিত করিয়া নিশ্চিত মরণের সন্নিহিত হইতে লাগিল। সত্যেন সেসন্স আদালত হইতে মৃত্যুর সাজা পাইয়া হাইকোর্টে আপিল করিল, কানাই করিল না। সে বড় সাধের মরণ মরিতেই আসিয়াছে, মরিয়াই তার সুখ; কি জানি আপিল করিতে গিয়া যদি মরণ-বঁধুর কুঞ্জ-পথে কাঁটা পড়ে। মরণের আশাপথ চাওয়া দিনগুলি সে ঘুমাইয়া ও গীতা পড়িয়া কাটাইত। এই নিষ্কাম অনাবিল শান্ত সমর্পণের জীবনে তাহার চুলগুলি হইয়াছিল বড় বড়, মুখশ্রী হইয়াছিল দীপ্ত ও ঢলঢল, ওজনে সে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। মরিবার প্রাতে চারটার সময় তাহাকে বধ্যমঞ্চে লইতে আসিয়া সকলে দেখিল, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি ঘুম হইতে তার জাগরণ, আর একটি দীর্ঘতর নিবিড়তম ঘুমের জন্য। তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে আমার ও অনেকের কুঠুরির সামনে দাঁড়াইয়া স্মিত-হাস্যে বিদায় নমস্কার করিয়াছিল, সেদিন প্রহরী বাধা দেয় নাই, পরন্তু আমাদের উঠানের দরজা মুক্ত রাখিয়াছিল। সে সহাস্য প্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময় রূপ আমি কখনও ভুলিব না, কানাই তখন মহাতাপস, প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পথ ভুল হউক, আর সত্য হউক, তাহার সে মরণের মহত্ত্ব যাইবার নয়, তাহার ক্ষাত্রগুণের গুণমুগ্ধ মানুষ তখন ইংরাজের মধ্যেও ছিল। আমাদের দেশবোধনে আত্মদানের শেষ ঋত্বিক কানাই। তাহার পর অন্যদলে অনেক মরণই

মরিয়াছে, কিন্তু কানাইয়ের পুণ্যস্মৃতি অম্লানই রাখিয়া গিয়াছে। যে কোন দেশে কানাইয়ের তুলনা নাই, কারণ এ বীরপূজার জাতি নাই, গোত্র নাই, দেশ নাই; যেখানে যখন মানুষ প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইয়া আর্ত্তত্রাণ ব্রত ধরে, সেইখানে তখনি সে নমস্য।

১৮

আমাদের বেভারা টেলিগ্রাফ

এতদিন আমরা জেলে আটক থাকিলেও বন্ধনদশার তুঃখের সিকি ভাগও ভোগ করি নাই। নরেন মরিল, আর আমাদেরও তুঃখের দিন ঘনাইয়া আসিল। জেলের মাঝে পিস্তল আনাইয়া রাজার সাক্ষীকে কীচক বধ করা ভারতে একটা অভাবনীয় ব্যাপার। এ ঘটনায় বাঙলার ও তথা ভারতের সরকারী মসনদ টলিয়া উঠিল; সুপারিন্ঠনঠন, ডাক্তার, জেলার সকলেরই চাকরী লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। আমাদের সুখে রাখা এবং অষ্টবন্ধনের মাঝেও পাথর চাপা দিয়া রাখার ব্যবস্থা না করার দরুণ, জেলের কর্ত্তাদের জবাবদিহির কড়া হুকুম আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল কালা পল্টন, গোরা পল্টন, গোরা জেলার, দো-আঁসলা ওয়ার্ডার আর পাঁচিল ঘেরা ক্ষুদে ক্ষুদে খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা।

নরেন মরিবার বোধ হয় দিন পাঁচ ছয় পরে, হঠাৎ একদিন সকাল বেলা—বাঘে ছাগল লওয়ার মত, এক একটি করিয়া ধরিয়া ধরিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষ পুনশ্চ আমাদের চোয়াল্লিশ ডিগ্রিসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গল্পগুজব হট্টগোলের এমন জমাট ভরা হাট শূন্য হইল, সঙ্গী গেল, খোলা ব্যারাকের খোলা হাওয়া গেল, গাছপালা, নীল আকাশ, পুকুর পাড়ের দৃশ্য গেল, আসিল গুমোট নীরবতা, আর চারটা দেয়ালের অন্ধ কঠিন চাপ; এ যেন আজ আমরা নতুন করিয়া ধরা পড়িয়া কারা-যন্ত্রণা পুনরপি অনুভব করিলাম। বিদ্রোহী ছেলের দল প্রথম প্রথম ঘরে ঘরে শিয়াল ডাকিতে লাগিল, কেহ কেহ

গান জুড়িয়া দিল, কেহ বা হারানো স্যাঙাতের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ধমক খাইয়া সাজার ভয়ে তাহা বেশিক্ষণ চলিল না।

এতগুলো আমুদে হররাবাজ প্রাণ যক্ষপুরীর ভয় ও গুমোট-চাপা হইয়া ক'দিনই বা নীরব থাকিতে পারে? পরস্পরের সহিত কথা বলিতেই হইবে, খবর আদান প্রদান করিতেই হইবে, তাহা যে উপায়েই হউক। আজ অমুকের ঘরের লোক দেখা করিতে আসিয়া কি বলিয়া গেল, কাল পূর্ণর ঘরে শামশূল আসিয়া কি ভুজং ভাজাং দিল, পরশু পাহারাওয়ালা পাঁড়েজী আড় চোখে এদিক ওদিক চাহিয়া, বাহিরের কি মিঠা সংবাদটি সুধীরের কাণে কাণে বলিয়া গেল, এই সব খোরাকীই তো এই খোজা চেড়ী বেষ্টিত নবাবী অন্তঃপুরে বেগম-বাহার জীবনের সম্বল। বিপদে শ্রীমধুসূদন! আমাদের মুস্কিলে আসান ছিল, বুদ্ধিমান চতুর কূটকৌশলী হেমদা'। সে এক বেতারা টেলিগ্রাম আবিষ্কার করিয়া পাশের কুঠুরীর ছেলেকে শিখাইল, সে আবার তার পাশের সঙ্গীকে তালিম দিল, এমনি করিয়া ২।৪ দিনের মধ্যে ৪৪টি ডিগ্রিতে কটাকট ঠকাঠক বেতারা খবর চলিতে লাগিল। এ টেলিগ্রামের মাল মসলা যন্ত্রপাতি একটা ছোট ঢিল আর কুঠুরীর দেওয়াল, ঢিলের অভাবে নখ দিয়া ঘা দিলেও কাজ চলে।

ইংরাজি বর্ণমালার ২৬টি অক্ষরকে পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হইল, পাঠক তাহা নিম্নের অঙ্কে বুঝিতে পারিবেন :—

		১।	২।	৩।	৪।	৫।
১।	...	a	b	c	d	e
২।	...	f	g	h	i	j
৩।	...	k	l	m	n	o
৪।	...	p	q	r	s	t
৫।	...	u	v	w	x	y z

দেওয়ালে বর্গের সংখ্যা ও বর্ণের সংখ্যা হিসাবে টোকা মারিয়া, সঙ্কেতে অক্ষর বুঝাইতে হইবে। ধরুন পাশের কুঠুরীর মানুষকে বলিতেছি, "Barin", তাহা হইলে প্রথমতঃ একটা ডবল টোকা ও পাঁচ সেকেণ্ড পরে দু'টা সিঙ্গল্ (Single) ছুটো টোকা দিলেই "B" অক্ষরটি বুঝাইবে ; তাহার পর একটা ডবল টোকা ও কিছু পরে একটা সিঙ্গল টোকা দিলেই "a" বুঝাইবে। "r" অক্ষরটি বুঝাইবার সময়ও এই নিয়মে চারটি ডবল টোকায় চতুর্থ বর্গ বুঝাইয়া, তিনটি ছুটো টোকায় তৃতীয় বর্ণ "i" বুঝাইতে দুটি ডবল টোকা ও ৪টা ছুটো টোকা এবং সবশেষে "n" তিনটি ডবল টোকা ও চারটি ছুটো টোকায় বুঝাইয়া একটা আলাদা টোকা দিলেই কথাটি পূর্ণ হইল জানানো হইবে। এই কু-কার্য্য করিতে করিতে কেহ আসিয়া পড়িলে, টেলিগ্রাফ receiver-কে সতর্ক করিবার জন্য দেওয়ালে গুম্ করিয়া একটা কিল মারার প্রথা ছিল। শীঘ্রই এই বেতারা টোকাগ্রাফ আমাদের মক্সো হইয়া গেল, প্রহরীরা প্রথম প্রথম বাধা দিত, শেষে দাঁড়াইয়া মজা দেখিত। শ্রোতা দেওয়ালে কাণ দিয়া থাকিলে এমন আস্তে টোকা মারা যায় যে পাশের ঘরের মানুষ শুনিতে পাইবে কিন্তু বাহিরের প্রহরী টের পাইবে না।

ইহার পর কথা বলার দুঃখ না ঘুচিলেও, মনের ভাব বিনিময়ে দুঃখের অনেকখানি লাঘব ঘটিল। কোন একটা বিশেষ কিছু ঘটিলে টোকাগ্রাফের মহিমায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ৪৪টি কুঠুরীতেই সংবাদটুকু পঁহুছিয়া যাইত। কুঠুরীতে আসিয়া পূর্ব্বের সকল সুখ-সুবিধাই হারাইতে হইল, রোগ হইলে গোলার আসামীকে আর হাসপাতালে লওয়া হইত না, কুঠুরীতেই পড়িয়া পড়িয়া মনের সুখে জ্বরে কোঁ কোঁ এবং পেটের অসুখে মুহুর্মুহু শৌচক্রিয়াদি করিতে হইত। ঔষধ পথ্য যৎকিঞ্চিৎ সেইখানেই আসিত, কম্পাউণ্ডারের সময় ও সুবিধা বুঝিয়া, রোগের বিক্রম বুঝিয়া আদৌ নহে। এইরূপে আমাদের দুঃখের দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে আন্দামান হইতে আমদানী হইয়া ছিল

সাহেব জেলার হইয়া আসিল, যোগেনবাবু বরখাস্ত হইয়া শেষ বয়সে চাকুরে-জীবনের পেন্সন অবধি হারাইয়া ভরাডুবি হইলেন। প্রথমে কালা সিপাহী আসিয়া সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় কুঠরী খুলিয়া, চিড়িয়া-গুলির অন্নজলের ব্যবস্থা করিত, শেষে আসিল চিফ ওয়ার্ডার টেঁস্থরাম উইল্‌শ, আর তিন চার জন গোরা ওয়ার্ডার। ইহাদের বর্ণনা আমি দ্বীপান্তরের কথায় করিয়া চুকিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না ; সর্ব্বশেষে হঠাৎ একদিন খাড়া সঙ্গীন হাতে নাচউলীর ঢঙে হাঁটু অবধি ঘাঘরা পরা হেল্‌মেটধারী গোরাচাঁদের উদয় হইয়া, রূপে লাবণ্যে আমাদের অঙ্গন উজ্জ্বল করিল। আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থা হইল যেখানে, সেটি বাঘের খাঁচারই উপযোগী। একটি ঘরের মাঝখান দিয়া দু'ধারে জাল ঘেরা রাস্তা গিয়াছে তাহার মাঝে পুলিশ পাহারা ঘুরিতেছে। জালের এপাশে জেলের দিকে আমরা একজন, আর ওঁপাশে জেলার, চিফ ওয়ার্ডার ইত্যাদির সহিত আমাদের আত্মজন। ব্যাধের জালে সান্ত্রীবেষ্টিত জেলার শাসিত এই সাক্ষাৎ যে কি পর্যন্ত সুখের, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন ; তবু না দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনের দিন নিতান্তই কাটে না, তাই তাঁহারা দেখিতে আসিতেন এবং হৃদয়ে দ্বিগুণ জ্বালা বেদনা লইয়া ফিরিয়া যাইতেন।

সমস্ত দায়রা ও হাইকোর্টের কাজির পালা দু'টি এইভাবে আমাদের কাটাইতে হইয়াছিল ; তন্মধ্যে সবচেয়ে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, নরেন মারা যাইবার ঠিক পরে ও দায়রা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বের কয় সপ্তাহ ; আর লম্বা রকম জীবন্ত সমাধি হইয়াছিল সেই সাড়ে ছয় মাস, যখন আসামীদের খোঁয়াড়বন্দী রাখিয়া, কেবল নথীপত্র ঘাঁটিয়া আর দুইপক্ষের গাউন ও সামলার চিঁহিঁ চিঁহিঁ রব শুনিয়া হাইকোর্টে আমাদের শেষ দফা দণ্ডভাগী করা হইতেছিল। দায়রার বিচার আরম্ভ হইলে তবু আদালতে দিয়া বন্ধুবান্ধবের দৌলতে মিঠাই মণ্ডা লুচি আণ্ডা খাওয়া যাইত, তারের ঘেরা খাঁচায় বসিয়া

ছত্রিশ মন্দরামে মিলিয়া মনের সুখে বক্ বক্‌ম কম্ করা যাইত, আর পুনশ্চ প্রভাতের নবমিলনের আশার স্বপন দেখিয়া কুঠুরীর মাঝে নিশা যাপন করা যাইত।

দায়রায় বিচারকালে অতি দীর্ঘ দিবস, মাস এই আনন্দমেলা বসাইয়া বসাইয়া দিনগুলি মন্দ যায় নাই, অনেকেই আমরা মাথার উপর উদ্যত আসন্ন ন্যায়-দণ্ড আনন্দের আতিশয্যে চোখেই দেখিতে পাই নাই। বিশেষতঃ সেই ক'জন আমরা বহির্জগৎটাকে একেবারে মুলতুবী রাখিয়া আনন্দের ঘর গড়িয়াছিলাম। যাহারা সাধন ভজন লইয়া থাকিতাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন অরবিন্দ, আপন যোগে আপনি মগ্ন ; তাহার পর ছিলাম আমি, দেবব্রত, বিজয় নাগ, নরেন বক্সী, শচীন সেন, ও আর দু' একজন। বাকী সকলে ছিল হল্লাবাজ "কে-কার-কড়ি-ধারে"র দল।

১৯

দায়রা ও হাইকোর্টের কাজি

যখন আমরা সেসন্স কোর্টে নিজ নিজ পাপের নিরীখ দিতে আসিলাম, তখন সত্য সত্যই জীবন্ত কবর হইতে উদ্ধার হইয়া, আলো বাতাসের ছুনিয়ায় নূতন করিয়া নিশ্বাস লইলাম। কারণ প্রথম ধরা পড়িয়া চোয়াল্লিশ ডিগ্রিসাৎ হওয়া সে তবু ছিল এক রোমান্স, তাহাতে একটা আজগুবি নূতন কিছুর মজা দেখিবার টান ছিল, কথা বলিবার বিরুদ্ধে এমন কড়াকড়ি ছিল না, স্নানাহারে বাহির হইয়া ছু'দশটা চেনা মুখ দেখিবার, মিলা মিশা করিবার অধিকার ছিল, উপরওয়ালা জেলার হইতে সান্ত্রী পাহারা সবই ছিল স্বজাতি। বার্লির কোর্টে যাওয়া তাই এমন করিয়া চূড়ান্ত আনন্দের হাট হয় নাই। এবার নরেন গোঁসাইকে ইংরাজ বাহাছুরের জেলে ব্যাঙখোঁচানী করিয়া মারার ফলে আমাদের হইয়াছিল একেবারে বস্তাবন্দী দশা; ইংরাজ জেলার, ইংরাজ ওয়ার্ডার, বন্দুক ধরা হাইল্যাণ্ডার পরিবেষ্টিত দশার পর, শাশুড়ী ননদ চাপা বধূর মত তটস্থ আমরা যখন বেথুন কলেজী পর্দ্দানসীন গাড়ী বন্ধ হইয়া একত্র হইলাম, তখন গাড়ীর ছুয়ার আটকাবামাত্র একখাঁচা মৃত হনুমানের হঠাৎ যুগপৎ জীবনলাভে কিচির মিচিরের মত সবাই একসঙ্গে মুখ খুলিল, কে যে কথা বলিতেছে, আর কে যে এ হট্টগোলের শ্রোতা, তাহা বুঝা গেল না।

বার্লির কোর্ট হইতে দায়রার ব্যবস্থা আয়োজনও অনুরূপ। আদালতে ঢুকিয়া দেখিলাম, একটি তারের জালের খাঁচা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মাঝে তিন চার সারি বেঞ্চি পাতা, তাহার মধ্যে

আমাদের ৩৬ জনকে ছাড়িয়া দিয়া প্রহরীরা দরজা বন্ধ করিল, বন্দুকধারী সান্ত্রী ও পিস্তলধারী সার্জেন্টের দল রহিল বাহিরে। সামনে ব্যারিষ্টার ও শামলার ভিড়, তাহার ওপারে উচ্চাসনে বিচারক রক্তমুখ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ আসীন। তাঁহার একপাশে কাঠ-গড়া ও আর একপাশে দুই জন আসেসারের আসন; ইহারা রাঙতার জুড়ি, রায় দিবার ছলনা করিতে পারেন, সত্যকার রায় দিয়া, জজের রায়ের উনিশ বিশ ঘটাইতে পারেন না।

৩৬টি আসামীকে রক্ষা করিবার লোভনীয় কাজটা ভাগ-বাটরা করিয়া লইয়া কয়েকজন ব্যারিষ্টার ও উকিলে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অরবিন্দের পক্ষে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও কে এন চৌধুরী উকিল নীরোদচন্দ্র চ্যাটার্জ্জিকে বাহন বা সহযোগী করিয়া দণ্ডায়মান; মোকদ্দমা কিন্তু দু' পা হাঁটিতেই পট পরিবর্ত্তন হইয়া উক্ত ব্যারিষ্টারদ্বয়ের স্থান গ্রহণ করিলেন দেশবন্ধু দাশ। বাকি বড় ও চুণাপুঁটিগুলির পক্ষে হইলেন ব্যারিষ্টারের মধ্যে পি মিত্র, ই পি ঘোষ, এস রায়, জে এন রায়, আর সি ব্যানার্জ্জি, আর এন রায় এবং শামলার মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ বসু, শরৎচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, তিনকড়ি ব্যানার্জ্জি, বঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী, বিনোদবিহারী রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও নরেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ উকিলগণ। সরকারী পক্ষে আমাদিগকে ঝুলাইবার চেষ্টায় রহিলেন ব্যারিষ্টার নর্টন ও বার্টন সাহেবদ্বয় ও প্রাতঃস্মরণীয় শামলা বাবু আশুতোষ বিশ্বাস। এই 'দীর্ঘ বরষ মাস' ব্যাপী বিচার বিভ্রাটে সর্ব্বসাকুল্যে ২০৬ জন সাক্ষী কাঠগড়াস্থ হইয়াছিল, প্রায় ২০০ মাল মসলা ও চারি হাজার কাগজ পত্র ঘাঁটিতে এবং এই ২০৬ জন সাক্ষীকে মন্থন করিতে গাউন ও শামলাদিগের ইস্তক জজ সাহেবের লাগিয়াছিল ২৩১ দিন, দুই পক্ষের ন্যায় মল্লদিগের মাত্র বক্তিমাবাজী ও বাহবাস্ফোটেই লইয়াছিল প্রায় ৪০ দিন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ আইনের পিত্তরক্ষারূপ কার্য্যে aider and

abetter রূপে রাঙতার জুরি দুই জন ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের নির্ব্বিষ রায়রূপ ফাঁকা আওয়াজটি প্রকাশ করিলেন ১৪ই এপ্রিল তারিখে; গুরুদাস বসু মহাশয়ের রায়ে বারীন্দ্র, উল্লাসকর, ইন্দুভূষণ, উপেন্দ্র, পরেশ, বিভূতি, হেমচন্দ্র ও হৃষীকেশ ছাড়া বাকি সকলেই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বোগাস জুরি বা আসেসার বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ও, পরেশ ছাড়া আর বাকি কয়জন সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর সহিত একমত ছিলেন। তবে তিনি শিশিরকেও অপরাধী করেন। ইঁহারা দু'জনেই ১২১ ধারা অর্থাৎ আমাদের তুল্য নিধিরাম সর্দ্দারের দ্বারা সাহান্‌সাহ বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটন-রূপ কুক্রিয়া হইয়াছে বলিয়া মানেন নাই। চিত্তরঞ্জন তাঁহার বক্তৃতায় ১২১ ধারার প্রয়োগ প্রমাণাভাবে যে অসিদ্ধ, একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বীচক্রফ্‌ট কিন্তু, না চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতায় ভিজিলেন, না আসেসারের দুর্ম্মতিতে টলিলেন, গোটা দুই বড়গোছের কাৎলাকে 'জয় মা' বলিয়া ঝুলাইতে না পারিলে, তাঁহার ন্যায়-লোলুপ ব্রিটিশ-চিত্ত শান্তি মানিতেছিল না।

বীচক্রফ্‌টের অকূল বিশাল বিপুল রায় ১৯০৯ সালের ৬ই মে প্রকাশিত হইল। তাহাতে আমাদের ভাগ্য লইয়া যে কন্দুক ক্রীড়া করা হইয়াছিল তাহা এবম্প্রকার!—তিনি ন্যায়ের নিরীখ কষিয়া ১৯ জনকে দণ্ডভাগী করিলেন আর ১৭ জনকে রেহাই দিলেন; যাঁহারা এই ন্যায়-ব্যাঘ্রের কবল হইতে বাঁচিয়া বাহির হইয়া গেলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, অরবিন্দ, দেবব্রত, নিখিলেশ্বর, হেমেন্দ্র, শচীন্দ্র, নরেন্দ্র বক্সী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্র গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বীরেন্দ্র ঘোষ, প্রভাস দে, দীনদয়াল, বিজয় ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জ সাহা ও হেম সেন। আর যাঁহারা ব্যাঘ্রের নখর দন্তে ঘায়েল হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি বারীন্দ্র ও উল্লাস দা' শ্রীদুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িবার হুকুম পাইলাম। রায় পড়িবার সময় এইখানে বীচক্রফট কৌতূহলী হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন; শ্বেতাঙ্গ কাজী বোধহয়

২০

কারাগারে নূতন জীবন

"দ্বীপান্তরের কথা"য় ও এই লেখায় অনেক স্থানে কথা প্রসঙ্গে আমার সাধনার কথা কিছু কিছু ইঙ্গিতে বলিয়াছি। ১৯০৮ সালের আরম্ভ হইতে এই দীর্ঘ ১৩ বৎসরের সাধনা ও অনুভূতির কথা বলিতে গেলে তাহা আর একখানি বই হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা তেমন করিয়া প্রকাশ করিয়া বলার এখনও সময় আসে নাই, কারণ এখনও আমি সে অপরূপ রূপ মানুষ হই নাই, যাহার নিত্য বসতি আনন্দ নগরে। তবে মোটামুটি সাধনার গতি ও ক্রম-পরিণতির একটা আভাস দুই কারণে দেওয়া দরকার; প্রথমতঃ এই কথা বুঝাইবার জন্য যে কি সম্বল লইয়া এত দুঃখের এতখানি পথ চলিয়াছি, আর দ্বিতীয়তঃ আমার বন্ধু-বান্ধব ও দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য যে আমরা এই মরা দেশে অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের জন্ম দিয়া সে শক্তিপূজার পথ ছাড়িয়া আবার কোন্ পথ ধরিলাম এবং কেনই বা তাহা ধরিলাম।

লেলের নিকট কি করিয়া সাধন লাভ হয় তাহা বলিয়া চুকিয়াছি। বাহিরে থাকিতে মাত্র দুই একটি অনুভূতি দিয়া সাধনা আরম্ভ হয়। নরেন্দ্র মারা যাইবার পর নির্জ্জন কারাবাসে আমার মন প্রথম সবদিক হইতে ফিরিয়া ভগবানের পথ ধরিল। তখন মৃত্যু কেশাগ্র ধরিয়া আছে, জীবনের সাধ আকাঙ্ক্ষা কাল-পুরুষের প্রচণ্ড আঘাতে নির্ম্মূল-প্রায় হইয়াছে, জীবন-গঙ্গার কোন দিকেই কূল নাই, সুরম্য তট বসতি ও বনানি শোভা নাই। আছে হয় মৃত্যু, নয় সারা জীবন

দেখিতেছিলেন আমরা হু'জনে 'সখি আমায় ধর ধর' বলিয়া পত্র পাঠ যথারীতি মূর্চ্ছা যাই কি না। উল্লাস তো মৃত্যুর পরোয়ানা পাইবা মাত্র জজের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "Thank you very much! বহুৎ ধন্যবাদ, সাহেব।" আমি কিছু বলিলাম না, কাজেই সাহেব এক রকম অপ্রস্তুত ও নিরাশ হইয়াই বাকি রায়টুকু পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। হেমদা বেচারীর উপর জজ সাহেবের বড় রাগ, কারণ সে কোন কথা স্বীকার করে নাই; হেমচন্দ্র, উপেন্দ্র, বিভূতি, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, সুধীর, ইন্দ্রনাথ, অবিনাশ ও শৈলেন্দ্র, জজ সাহেবের রায়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল এবং তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ইহার মধ্যে তাঁহার মতে কেবল বিভূতি যুদ্ধ করিয়াছে, আর বাকি কয়জন যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ১২১এ ও ১২২ দফায় ইন্দুরও যাবজ্জীবেৎ কালা-পানিসাৎ ও পার্থিব সম্পত্তি গ্রাস ঘটিল। বলা বাহুল্য এইসব ভবঘুরেদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল পরিধানের কাপড় ও মাটির সানকি। সন্ন্যাসীর লোটা কম্বল থাকে, ইহাদের তাহাও ছিল না, সুতরাং জজ সাহেবের রায়ে সরকার বাহাদুরের বিশেষ ধনবৃদ্ধি ঘটে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

পরেশ, শিশির ও নিরাপদ কোন খুন খারাপীতে সংশ্লিষ্ট ছিল না বলিয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সহিত দশ বৎসর দেশান্তরের দণ্ড পাইল। বাকি কয়জন, বিশ বছরের কম বয়সের বলিয়া, নিম্নলিখিত হারে "দিও কিঞ্চিৎ, না কর বঞ্চিৎ" গোছের সাজা পাইল!—অশোক, সুশীল ও বালকৃষ্ণ হরি কাণে সাত বৎসর আন্দামান এবং কৃষ্ণজীবন সান্যাল এক বৎসর সশ্রম কারাবাস। এই হইল জজ সাহেবের রায়। তাহার পর মোকদ্দমা গড়াইতে গড়াইতে গেল হাইকোর্টে, আর আমরা গেলাম শ্রীঘরে। সাত মাস পর রায় বাহির হইল কিছু উনিশ বিশ হইয়া, ফলে আমি ও উল্লাস দা' প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।

ভরিয়া নির্ম্মম কারাগৃহ। সুতরাং সাধনের ইহাই অনুকূল সময়, যোগাসনে বসিবার এমন শ্মশান ক্বচিৎ মিলে।

আমার সাধনা লেলের দেওয়া দুই তিনটি ক্রিয়া লইয়া ; কিন্তু তখন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব খুব বেশী, তখন সবে তাঁহার কথামৃতগুলি ও চৈতন্যভাগবত পড়িতেছি। চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ ও লেলে এই ত্রিস্রোতায় পড়িয়া আমার গোড়ার সাধনা প্রধানতঃ ভক্তিমুখীই ছিল। তখন সেজদাও শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণ, তাঁহার প্রভাবও আমার মাঝে অলক্ষ্যে কম কাজ করে নাই। তাহার উপর দেবব্রতের প্রেমের সাধনা, সে নিজের সাধনায় গীতার জ্ঞান ও কমলাকান্ত চণ্ডীদাসের প্রেম অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে মিশাইয়া লইয়া ছিল। যখন সেসন্স কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, তখন দেবব্রত, আমি, নরেন বক্সী, বিজয় নাগ ও শচীন্দ্র সেন একসঙ্গে সাধনা করিতেছি। অরবিন্দ মৌন নিশ্চল আসনে দিবারাত্র সাধনায় মগ্ন, জেলে কুঠরীতে তাঁহার সেই অবস্থা, কোর্টেও একটি কোণে একান্তে আপনাতে আপনি ডুবিয়া তাঁহার তদবস্থা।

আমাদের সাধনায় কথা ছিল, গান ছিল, শাস্ত্র পাঠ, তর্কবিতর্ক ছিল ; তাঁহার সাধনা কিন্তু একেবারে মৌন অন্তর্মুখ একাগ্র ব্যাপার ; তাঁহার সঙ্গী ছিল না, কাজ ছিল না, অন্য ভাবনা চিন্তা ছিল না, ছিল শুধু পূর্ণ উৎসর্গে

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিত-চিত্ত নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥

দেখিলে মনে হইত এ মানুষ আর বহির্জ্ঞানে জাগিয়া নাই, যেন স্বপ্নে চলিতেছে, বলিতেছে, যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাহিরের দুয়ার দিয়া অন্তরের কোন্ নিভৃত পুরীর মহোৎসবে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই সাধনমুখী মানুষের আপনিই সাধন পাইত, তাই তাঁহার নীরব প্রভাব এ কয়টি জীবনে তখন বড় কম কাজ করে নাই।

আমি ধ্যানে নানা রকম সাধনা পাইতাম, আর সেই সব ক্রিয়া

প্রক্রিয়া ধরিয়া ধ্যান ও বিচার করিতাম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে চিন্ময় সমাধির ধ্যান পাইয়াছিলাম,—সে যেন অনন্ত চৈতন্যময় আকাশে পাখা মেলিয়া পাখী উড়িতেছে, যেন বামে দক্ষিণে অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ নিথর জলরাশি আর সাধক তাহার মাঝে কুম্ভ। দেবব্রতও আমার তখনকার সাধনায় অনেক সাহায্য করিয়াছিল। সে নিজের প্রক্রিয়া আমার মাঝে সঞ্চার করিয়া দিত, সে যাহা চাহিত, ধ্যানে আপনি আমার মধ্যে তাহা আপনি জাগিয়া উঠিত।

এমনি করিতে করিতে যখন দায়রার বিচার সমাপ্ত হইল, তখন আবার আমায় একান্তবাসে সাত মাস মৃত্যু-দণ্ড সম্মুখে করিয়া সাধনা করিতে হইল। আমি ছিলাম ফাঁসীর ঘরে, সারা দিবা রাত্রের মধ্যে কাহারও মুখ দেখিতে পাইতাম না, পাশের ঘরে উল্লাস ছাড়া আর কাহারও সহিত লুকাইয়াও কথা কহিতে পাইতাম না। উল্লাসও তখন আমার মতই মৃত্যুপথের যাত্রী। তখন আমার সাধনে এত জপ তপ ধ্যান আদি প্রক্রিয়া জুটিয়াছে যে, তাহা করিতে আমার চৌদ্দ ঘণ্টা সময় লাগিত।

আমার ঘরে যে কয়জন প্রহরী পালাক্রমে পাহারা দিত, তাহার মধ্যে লা— ছিল এক গৃহী সাধকের চেলা। বৎসরে একবার সে সাধক অযোধ্যা ছাড়িয়া পর্যটনে বাহির হইত, লা—র গ্রামেও আসিত। তাহার কাজ ছিল, কোন বৃক্ষতলে বা মন্দিরে বসিয়া ভাগবত পাঠ, সে পাঠের আকর্ষণে বিশাল জনতার সে-স্থানে মেলা বসিয়া যাইত; এমনি করিয়া সাধকের অর্থ উপার্জ্জন আপনি হইত। লা— নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহাকে সাধনা দিবার জন্য ধরিয়া পড়িলে, সে কাগজে একটি পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। সেই চিহ্নটি মাথার উপর রাখিয়া তাহারই ধ্যান করিতে হইত। এইরূপ দশ বার দিন করিবার পর একদিন স্নানের সময় কলের জল মাথায় পড়িতে পড়িতে এই ধ্যান আপনি জাগে এবং লা— অচেতন হইয়া পড়ে। সেই অচৈতন্য অন্তর্মুখ দশায় সে পুলিশ হাসপাতালে পনর দিন ছিল, সেই অবস্থায় কত কি

সূক্ষ্ম জগতের দর্শন তাহার হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান না থাকায় বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে নাই। সেই অচেতন অবস্থা হইতে উঠিয়া তাহার দেহে সর্ব্ব-সম্মোহন শক্তির পূর্ব্বাভাস জাগিয়া ওঠে। এই শক্তিই হইল তাহার পতনের কারণ—সে একদিন কোন রূপসী নারীর মোহে পড়িয়া তাহার এত কষ্টে পাওয়া সব সাধন সম্বল খোয়াইল।

এই ব্যক্তি আমায় সাধন করিতে দেখিয়া আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে সকলের অগোচরে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হইল। সে বাহিরে অরবিন্দের নিকট আমার পত্র লইয়া যাইতে রাজী হইল। আমার সেজদা তখন আমার ন-মেসো কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ী, সঞ্জীবনী কার্য্যালয়ে আছেন। মেসো মহাশয় তখন দেশান্তরী দশায় (doportation) বাঙলার বাহিরে আবদ্ধ। এই লা— আমার সাতখানি পত্র ক্রমে ক্রমে সেজদার কাছে লইয়া যায় এবং আমায় তাহার উত্তরও আনিয়া দেয়। প্রথমে সে প্রতি পত্রের জন্য ৫৲ টাকা লইত, শেষে আমাদের সৌহার্দ্দ্য জমিয়া উঠিলে সাধন লইতে ব্যাকুল লা— আর কিছুই লইত না।

২৯

অরবিন্দের পত্রের ফল ফলিল

সেজদার পত্রগুলি পাইবার আগে পর্য্যন্ত ভক্তির প্রবাহই চলিতেছিল। নিজের অঙ্গে চতুর্ভূজার ভাব স্ফূর্ত্তি হইত, দেখিতাম আমি হুবহু এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী নারী, আপন মহতী শক্তি ও আনন্দে ভরপূর হইয়া চলিতেছি, ফিরিতেছি। অন্য মানুষেও দেবী-ভাব দর্শন করিতাম, ধ্যানে নানা স্তরের আনন্দ আসিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে আমায় মগ্ন রুদ্ধশ্বাস করিয়া দিত। কোনটি প্রেমানন্দ, কোনটি প্রাণের স্তরের অশুদ্ধ আনন্দ, কোনটি উহাপেক্ষা কতক শান্ত অহেতুক আনন্দ, আবার কতকগুলি দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব যোগে আনন্দ। ভক্তি পথের অনেক কিছুই হইল, চেতন সমাধিও দুই একবার হইল, স্বেচ্ছা মৃত্যুর শক্তি কামনা করিয়া এমন সামর্থ্য হইল যে, প্রাণ-তরঙ্গ পদতল হইতে গুটাইয়া গুটাইয়া হৃদয়ে আসিয়া লীন হইত, সংজ্ঞা ফিরিলে যখন জাগিতাম তখন দেহ কিছুক্ষণ হিম ও গুরুভার ও পাথরের মত আড়ষ্ট হইয়া থাকিত।

সেজদা তাঁর সাতটি পত্রে আমায় বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন যে, আমার ক্রিয়া সাধনার অবস্থা শেষ হইয়াছে, এখন সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ সমর্পিত না হইলে আর উন্নতি হইবে না। আমি সেই সাতটি পত্রের উত্তরে তাঁহার সহিত কত তর্কই না করিলাম, সাধনা তখন আমার এক সাধের সংসার, তাহার গর্ব্ব ও মোহ আমায় পাইয়া বসিয়াছে। তখন আমার সে বুদ্ধি—সে উপরের জ্ঞান নাই যাহা দিয়া বুঝিব যে, দু'দশটা সাধনা পাইলেই পরমপুরুষার্থ হয় না;

নীচের প্রকৃতি উপরের তরঙ্গের চাপে যখন বশে থাকে তখন মনের আঙ্গিনায় কত কি দিব্য ভাব ও বিভূতি খেলিয়া যায় বটে, কিন্তু নীচের প্রকৃতি জাগিলে সেই দীন মলিন রিপুর মানুষ।

সে জ্ঞান না থাকিলেও একদিন অন্তরদশা হইতে জাগিয়া হঠাৎ প্রাণ মনের অশুদ্ধি মলিনতা দেখিতে পাইলাম, ব্যাপারটা সে ভাবে বুঝিলাম না, বুঝিলাম ভক্তিরই চোখে। তখন মনে জাগিল রূপ গোস্বামীর কথা—যার স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান আছে, যার নীচের দেহ প্রাণই সার, তার গোপীপ্রেম—শুদ্ধ প্রেম হয় না। আমার হঠাৎ মনে জাগিল যে, প্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার হইতে আমায় জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে। এই অবস্থা লইয়া আমার আন্দামান যাত্রা।

আমার সারা আন্দামান জীবন একখানি বই সম্বল করিয়া জ্ঞানের সাধনায় কাটিয়াছে। বইখানি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মাঝে মাঝে শঙ্করের বইগুলি ও পঞ্চদশীও পড়িতাম। কিন্তু প্রায় চার পাঁচ বছর আমি অন্য কোন বই হাতে করি নাই। উপেন তখন শঙ্করবিদ্বেষী, সে রাগ করিত, বলিত, "ও বইখানা পুড়িয়ে ফেল"। আমি কোন কথা শুনিতাম না, পরের কথা অযথা শুনার রোগ আমার কোন দিনই ছিল না। জ্ঞান-বিচারে অনেক ব্যাপার ঘটিল, চোখের সামনে সূক্ষ্মজগৎ খুলিল; সূক্ষ্মজগৎ কি জানিতাম না, কিন্তু এই বাস্তব জগতের অপেক্ষাও সত্যতর উজ্জ্বলতর জীব ও জগৎচিত্র দিবারাত্র যখন তখন দেখিতাম ; তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা মনে পড়িল, "যা নাই ভাণ্ডে তা' নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। জ্ঞান বিচারে আমার রিপুর শক্তি মরিয়া আসিল, মৌন গাম্ভীর্য্য অভ্যাস হইল, মনকে তার বিষয় আসক্তি হইতে স্বেচ্ছায় টানিয়া ফিরাইবার বল জন্মিল, আর ক্রমে শুখাইয়া আসিল প্রেম, স্নেহ, মমতা, দয়া আদি সব কোমল বৃত্তি। জগতে সকলই মায়া, তবে আর কিসের কি? বামে দক্ষিণে উর্দ্ধে নিম্নে অখণ্ড ব্যোম বা জলরাশি জ্ঞান করিতে করিতে এক শান্ত গম্ভীর শীতল মগ্ন আনন্দ উপর হইতে নামিয়া আসিত, আমি বুঁদ হইয়া সেই

অটল শান্তির মাঝে বসিয়া থাকিতাম। কখন কেহ যেন একখণ্ড বরফ আমার মাথা বা বুকের মাঝে রাখিয়া দিত। এই দীর্ঘ বার বৎসরে কত ব্যাপার কত অভিনব অনুভূতিই যে হইয়াছে, তাহা লিখিতে গেলে এমন আর একখানি পুস্তক হইয়া পড়িবে। মোটের উপর এই বুঝিলাম যে ভগবান সত্য, তাঁহাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বহু বিভূতি অনুভব করিলাম—বুঝিলাম এই জগৎই সব নয়। মানব-জ্ঞানের মাঝে পরদার পর পরদা, লোকের পর লোক, ধামের পর ধাম আছে; একটি সূর্য্যকণার মাঝে চতুর্দ্দশ ভুবন দুলিতেছে।

তাহার পর দ্বীপান্তরের শেষ বৎসর আমার সাধনা ফুরাইয়া আসিল। যেন এতবড় অন্তর্মুখী গতি কোথায় পাথরে বাধিয়া গেল, আমি অতি শুষ্ক ভাবহীন নীরস জীবনে ভাসিয়া উঠিলাম। লুপ্ত ক্ষীণ প্রবৃত্তি কামনা সব আবার কোথা হইতে যেন মাথা তুলিতে লাগিল। এত দিন লাগিয়াছিল আমার ঐ একটি কথা বুঝিতে—সকল ক্রিয়া ত্যাগ করিতে, অরবিন্দের সমর্পণ যোগের জন্য প্রস্তুত হইতে। এই শেষ বৎসরের আরম্ভেই আমার মন প্রাণ ভরিয়া এই ধ্রুব বিশ্বাস জাগিয়া উঠিল যে, আমি জেল হইতে মুক্ত হইব। কারাজীবন আমার ফুরাইয়াছে, তপোভূমি ভারত আমায় টানিতেছে। গীতার সেই কথা স্মরণ হইল, "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চির্দ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। আমার এ সাধনা ত স্তম্ভিত হইয়া থাকিবার নয়, পরম ধামের স্বর্ণ-দুয়ার এতখানি দুলিয়া উঠিয়া, এতখানি মুক্ত হইয়া ত আবার রুদ্ধ হইবার নয়। এ সাধনা পূর্ণ করিতে ভারতে যাওয়া আমার অনিবার্য্য, আমি এই বিশ্বাস অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া দিন গণিতে লাগিলাম।

২২

কারামুক্তি

তার পর আমার বিশ্বাসের স্বপ্ন ফলিল, আমার কারামুক্তি আসিল। এক দিন জেলের তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, আমি, উপেন ও হেমদা আলিপুর জেলে নীত হইয়া সেখান হইতে মুক্ত হইব। আশায় ঔৎসুক্যে সুখের অনিদ্রায় জেলখানায় কয়েকদিন কাটিল, তাহার পর একদিন শুভ প্রাতে আমরা জেল-ফটক পার হইয়া বাহিরের মুক্ত হরিৎ জগতে পা দিলাম। তখনও সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীর দল, কারণ তখনও আমরা মুক্তির পথে মাত্র। সঙ্গে ২২।২৩ জন শিখ রাজনীতিক-বন্দীও মুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল, তাহারা প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশ বাতাস মুখরিত স্তম্ভিত করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল,

“ধন ধন পিতা দশমেশ গুরু
জিহ্ চিঁড়িয়াতু বাজ তুড়ায়ে”

‘ধন্য ধন্য পিতা দশম গুরু, যিনি বাজের মুখ হইতে পাখীকে ছাড়াইয়াছেন’। আমরা বোটে চড়িয়া নীল তরঙ্গ ভেদ করিয়া জাহাজে গিয়া উঠিলাম, তখনও সেই জয়গান চলিতেছে। আজ আমার সত্য সত্যই ধারণা হইল, এ জীবনে ভগবানের আরও কাজ আছে। আন্দামানে যে লোহা পিটাইয়া, জগতের চক্রী যে অস্ত্র গড়িতেছিলেন, তাহা তাঁহারই ব্যবহারে লইয়া যাইতেছেন। তবু মানুষের মন তো? সে তখনই কল্পনায় নূতন সাধের সুখ-গেহ বাঁধিতে বসিয়াছে, যত মরা আশা এই নব মুক্তির ভরা বাদরে আবার মুঞ্জরিয়া জীবন-মরু হরিৎ করিয়া তুলিতেছে।

জাহাজে তিন দিন তিন রাত্র কাটাইয়া চতুর্থ দিনে অতি প্রত্যুষে গঙ্গার মোহনা দেখা দিল, বঙ্গ-জননীর ক্ষীণ শ্যামাঞ্চল রেখাটি সেখানেও চরের উপর বিছানো! এত দিনকার শঙ্করাচার্য্যের মায়া-বাদের সাধক মন এইটুকু মায়ার টানে চোখে জল লইয়া সেই সুজলা শ্যামারূপ দেখিতে লাগিল। ক্রমে দুই কূল হরিৎ হইয়া গ্রামগুলি দু'পাশে জাগিয়া উঠিল, বেলা চারটার সময় জাহাজ আসিয়া তক্তা ঘাটে লাগিল। আমাদের ঘাটে নামিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

কর্ণেল হ্যামিল্টন তখন আলিপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আমাদের পুরাতন রাবণ রাজার পুরী আলিপুর, কালের চক্রে এমনি পরিবর্ত্তিত শ্রীসম্পন্ন রূপ লইয়াছে যে, দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না। আমরা মনে করিয়াছিলাম, সেদিন শনিবার রাত্র ও পরের দিন রবিবার আমাদের জেলে কাটাইতে হইবে; সোমবারে যদি কেহ উপরওয়ালা আসিয়া আমাদের মুক্তির হুকুম দেয়, কারণ ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, একটা না একটা সর্ত্ত লিখাইয়া না লইয়া গভর্ণমেণ্ট ছাড়িবে না। তখন কর্ণেল হ্যামিল্টন উপস্থিত ছিলেন না, জেলার বাবুরা তাঁহাকে টেলিফোন করিয়া আমাদের জন্য আলুর দম ও লুচি আনিতে দিলেন। হঠাৎ সাহেব আসিয়া আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন, প্রথম প্রশ্নই করিলেন, "I suppose, you would like to go home at once. I have the order of the Govt. to release you as soon as you arrive. তোমরা এখনি বাড়ী যেতে পেলে তাই চাও বোধ হয়? আমার কাছে গভর্ণমেণ্টের হুকুম আছে, তোমরা এসে পৌঁছবা মাত্র মুক্তি দেবার জন্যে।" আমরা অবশ্য সায় দিলাম, তখনই মোটর আসিল, সাধের লুচি ও আলুর দমের মায়া কাটাইয়া আমরা সরিয়া পড়িলাম।

সে কি আনন্দ! আজ পিছনে ওয়ার্ডার নাই, জমাদার নাই, ব্যারি-ভীতি জগতে কুত্রাপি নাই। আমরা মুক্ত! বার বৎসরের আন্দামান বাসের পর মুক্তির স্বাদ যে কি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব তাহা

বলিয়া বুঝাইবার নয়। আমরা দাশ মহাশয়কে বাড়িতে না পাইয়া, সাতকড়িপতি বাবুর বাড়ী আশ্রয় লইলাম। উপেন সেই রাত্রেই বাড়ী গেল, হেমদা পরদিন মেদিনীপুর যাত্রা করিল। আমি রহিলাম কলিকাতায়। তাহার পর নারায়ণের ভার গ্রহণ, বিজলীর প্রতিষ্ঠা, আর্য্য পাবলিশিং হাউসের গঠন ও আমার নব-সাধনার তীর্থ পণ্ডিচারী যাত্রা। এ সব কাহিনী এখানে বলিবার নয়, শুধু এই নব-সাধনার মূল কথা কি, তাহা বলিয়াই এই আত্মকাহিনী শেষ করিব।

২৩

সৃষ্টির নূতন সত্য

আমি দ্বীপান্তর হইতে ফিরিবার কয়েক মাস পর প্রথমবার পণ্ডিচারী গিয়াছিলাম মাত্র ৬ দিনের জন্য। সেবার কিছু বুঝি নাই, কারণ তখন কাজ আমায় আবার পাইয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম তিন চার মাসের জন্য, সেইবার নূতন সাধনার আস্বাদ পাইলাম, সাধনার গতি, ধারা, ছন্দ আমার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কারণ এ সাধনায় সাধ্য নাই, সাধনা নাই, হিসাব নাই, পদ্ধতি নাই; আছে শুধু শান্ত নীরবতা, অনন্ত বিশ্বাস আর উর্দ্ধমুখে আপনাকে মেলিয়া অপেক্ষা। এ সাধনের সাধক মানুষ নয়, মানুষের আধারে ভগবানের শক্তি; মানুষ যদি সমর্পণে চুপ করে আর প্রাণ মন চিত্ত ভরিয়া সায় দেয়, তাহা হইলে সে শক্তি জ্যোতির তরঙ্গে, শান্তির জোয়ারে, জ্ঞানের ছন্দে নামিয়া সব আপনি করিয়া লয়। তাহার পর সব চেয়ে বড় কথা, এ সাধনা জীবনের সাধনা, পরমে আর ঐহিকে এক সোণার সেতু; খণ্ড মানুষকে ধীরে ধীরে বৃহতে তুলিয়া ভগবানের আনন্দে সমাসীন করিয়া তাঁর ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করা, মানুষকে দেবতা করিয়া গড়া—to divinise man।

তোমরা বলিবে দেবতা হইয়া লাভ কি? আমি বলিব খণ্ড থাকিয়া লাভ কি, আপনার স্বরূপ হারাইয়া নিজের পূর্ণ মহিমায় বঞ্চিত রহিয়া লাভ কি? ইহজগতে জ্ঞান আমাদের অন্বেষণের ধন, আনন্দ আমাদের কাম্য, শক্তি আমাদের জীবনামৃত; তবে তা অজস্র অসীম পূর্ণ করিয়া পাইব না কেন? কেন ক্ষুদ্র থাকিব, কেন আমার রাজ-

প্রাসাদ, সাম্রাজ্য হারাইয়া তাহারই গুপ্ত কোটরে এতটুকু হইয়া থাকিব ? মানুষ নিজের জড় রুদ্র স্বরূপটি এমনি আগ্রহে আঁকড়িয়া আছে যে, সে আপনার অখণ্ডতাকে, পূর্ণতাকে ভয় করে, ভাবে বুঝি তাহার রাজবেশ পরিলে তাহার ছিন্ন কন্থাটুকু হারাইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা নিজের আনন্দের শক্তির জ্ঞানের ঘর জানি না বলিয়াই আমাদের মন প্রাণ এমন ছোট যে, যে মানুষ যখনই উপরের ভাণ্ডারের চাবি পাইয়াছে, তাহারই আশার এ দীনত্ব তখনই ঘুচিয়া গিয়াছে। আজ যদি তোমায় কেহ অনন্তের জ্ঞানে আনন্দ স্থির করিয়া শক্তির ঈশিত্বে বসাইয়া এই দেহ মন প্রাণ তোমারই হাতের যন্ত্র করিয়া দেয়, তাহার পরক্ষণেই সে রাজ-শ্রী তোমার হারাইয়া গেলেও স্মৃতি যাইবে না, তুমি ঐ রাজ্য ফিরিয়া পাইতে সাধনায় বসিবে।

এ নূতন যোগের বড় নূতন কথা এই যে, ভগবানকে এক আধ বার দেখা নয়, এই নিম্নমূল জীবনকে ঊর্দ্ধমূল করিয়া ভগবানে পাওয়া, মন চিত্ত প্রাণ ও দেহের উপাদান অনু-পরমাণু বদলাইয়া, উপরের শুদ্ধ তেজোময় সত্তায় রূপান্তর করিয়া লওয়া, তাহার পর সেই দিব্য আধারে ভগবানকে মূর্ত্ত করা। এইখানে এ যোগ জীবনের যোগ, মানুষকে তার স্বরাজ্য দিবার যোগ, পূর্ণ মানুষের সহজ দেবত্ব, অখণ্ড শিবত্ব তাহাকে ফিরাইয়া দিবার যোগ। এমন কিছু সত্য সত্যই যদি কাহারও জীবনের দুয়ার খুলিয়া আসে, যদি কেহ এই নিজের, এই বৈকুণ্ঠের জ্যোতিধাম আপন সত্তার মাঝে উত্থিত দেখে, তবে সে মানুষের কি হয় বল দেখি। ধর্ম্ম যাহার কাছে সত্য, জীবন্ত, প্রকট ও নিত্য আস্বাদনের ধন, তাহার মর্ম্মকথা মর্ম্মী ছাড়া কে বুঝিবে ?

পণ্ডিচারীতে আরও দুইবার আসিয়া সাধনা করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আর দ্বিধা সন্দেহের স্থান রহিল না, মানুষে এ দেবত্ব হয়, আর তাহাই এ সৃষ্টির উত্তম রহস্য। প্রথমে ইহা জন কয়েক শক্তিমান আধারে রূপ নিবে, তাহার পর জগতে সে শক্তি কাজ করিয়া করিয়া

আপন রাজ্য গড়িয়া তুলিবে, মনের মানুষ বৃহতে উঠিয়া যাইবে। কবে তাহা পূর্ণ হইবে, কত বৎসরে, কত যুগে, তাহা যাহার কাজ সেই লীলার ভগবান জানেন, আমি তাহার ব্যর্থ কামনায় অধীর নই।

ইহার মানে এ নয় যে আজই রাজনীতির কাজের কাজী রাজনীতি ছাড়িবে, সমাজের শিল্পী সমাজসৌধ গড়িবে না, কবির কবিতা, চিত্র-করের তূলির রং সৃষ্টি ভুলিয়া থামিয়া যাইবে। আজই সবাইকে ডাক দিবার যুগ তো আসে নাই, কিন্তু ভগবানের এই নূতন সত্যের চিহ্নিত মানুষকে—প্রথম পথ-নির্ম্মাতা অসাধ্য সাধককে ডাক দিবার দিন আসিয়াছে, আমরা নূতন জগতের জীব ও সত্যমূর্ত্তি কেন্দ্রটি গড়িতেছি। তাহারই জন্য এ কয়টি জীবন উৎসর্গিত। এ কাজের প্রোগ্রাম নাই, পথ নাই, ছকবাঁধা বিধি-ব্যবস্থা নাই; ইহার আছে শুধু এই কয়টি জীবন আঙিনা আর সেখানে বিশ্ব-শিল্পীর গোপন রচনা, তাঁহার জ্যোতির আসা যাওয়া, নূতন ভাবী জগতকে কারণে সূক্ষ্মে পরে স্থূলে রূপ দেওয়া, ভগবানের রাজসিংহাসন এই স্থূল মাটির উপর রচিয়া তোলা। যাহারা এই নূতন সত্যে জাগিয়াছে তাহারা কোন ডাকে, কাহারও ডাকে ফিরিবে না, কারণ তাহারা আর ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মানুষ নহে, তাহারা সত্যের মানুষ। পুরাতন চিরদিনই তাহার বাঁধা রাস্তায় নূতনকে ফিরাইতে চায়, নূতনের রথ কিন্তু ফিরে না, তাহার অনন্তমুখী গতিতে উষা হইতে নব উষায়, সত্য-চূড়া হইতে নূতন সত্যের চূড়ায় চলিয়া যায়, নূতন সৃষ্টির ছন্দে বাঁধা তাহার সে গতি সে নবজীবন জগতে ফলিতে দিন লাগে, তাহার চূড়ার সূর্য্য মাটির দিগন্তের কোলে উদিত হইতে বেলা হয়।

॥ সমাপ্ত ॥